SYNTHESIS

KRISHNAGAR WOMEN'S COLLEGE

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY

VOLUME-1

2024

Message from the Teacher-in-charge

From the Teacher-in-Charge's office, I extend heartfelt congratulations to the Department of Philosophy at Krishnagar Women's College for their commendable effort in publishing this e-magazine. Academic excellence remains a cornerstone of our institution, and the Philosophy Department's dedication to this cause is truly inspiring. This e-magazine offers a valuable platform for our students to articulate their ideas and grow as future philosophers. I am confident that this initiative will thrive and attract more students to share their insights. I look forward to the continued success of this publication and the intellectual growth it fosters in our students.

Dr. Suryendu Chakraborty

Teacher-in-Charge

Krishnagar Women's College

Message from the Ex-Principal

It gives me immense pleasure to announce the upcoming publication of thee-magazine by the Department of Philosophy at Krishnagar Women's College. This publication, titled "Synthesis," showcases a diverse collection of academic articles contributed by both students and faculty members.

The department takes great pride in its dedicated faculty and the sincerity and discipline of its students. In recent years, they have successfully organized numerous seminars and special talks to enhance regular classroom learning. Synthesis, the e-journal, is another significant initiative of the department to foster research acumen among the students.

I extend my heartfelt congratulations to the faculty and students of the Department of Philosophy and wish them all the best in this new endeavor.

Dr. Natasa Dasgupta

Ex-Principal

Krishnagar Women's College

বিভাগীয় প্রধানের কলমে

কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজের দর্শন বিভাগের বিভাগীয় পত্রিকা Synthesis এর প্রথম আন্তর্জালিক (E- Journal) সংখ্যা ২০২৪ এ প্রকাশিত হতে চলেছে, যা অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের। পূর্বেও Synthesis পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান সময়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আন্তর্জালিক পত্রিকা রূপে Synthesis এর প্রকাশ নিঃসন্দেহে আরো একবার শুধুমাত্র ছাত্রীদের বুদ্ধিদীপ্ত মননে উৎসাহের জোয়ার আনবে তা নয় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত সকলে স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহে উৎসাহিত হবেন।

সহজভাবে ও ভাষায় দর্শন চর্চা ও চর্যার জায়গাটি তুলে ধরা একটু কঠিন। যা ছাত্রীকুল অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে মূল কথাগুলি মোটামুটি ভাবে তুলে ধরার প্রয়াস করেছে। পাঠ ব্যবস্থার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বিষয়গুলি সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে ধরাবাধা সীমারেখার মধ্যে। ছাত্রীদের কলম ও ভাবনার মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি ভুলভ্রান্তি শুধরে নেওয়ার জন্য নতজানু হয়ে সকলের কাছে প্রার্থনা করি সমালোচনার। তাদের ভাবনা ও কলম সংযোগের হাতে খড়ির এই সূচনা লগ্নে শ্রদ্ধেয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, পূর্বতন মাননীয়া অধ্যক্ষা, কলেজের দর্শন ও অন্যান্য বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাগণের ভাবনাচর্চার সাহচর্য তাদের ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে অনেকটা রক্ষা করেছে। ছাত্রীদের চিন্তাভাবনার ক্ষুদ্র পরিসরে অধ্যাপক অধ্যাপিকা সকলের উদার সহযোগিতা নীরবে এই কর্মসূচিতে অন্য দৃঢ়তা প্রদান করেছে তাদের অজান্তেই। বিভাগের প্রায় সমস্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত ছাত্রীরা বিপাশা, স্বাতি, অন্তরা, প্রিয়াঙ্কা, সায়নী ও সৌমি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হঠাৎই ভালো এবং দায়িত্ববতী হয়ে যাওয়ায় তাদের কথা উল্লেখ না করলেই হয় না - তারা এই কর্মসূচির সফল রূপায়ণের কান্ডারী। আর যাদের কথা আমার কালির আঁচড়ে ফুটলো না তারা আমার বিভাগের ও কলেজের রাতের আকাশের তারা।

কল্পিতা নন্দী

বিভাগীয় প্রধান ও সহকারী অধ্যাপিকা

দর্শন বিভাগ

কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ

সম্পাদকের ভাবনা

কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজের দর্শন বিভাগের বার্ষিক পত্রিকা 'Synthesis' - এ সকলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাই। এটি আমাদের বিভাগের পক্ষ থেকে একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা যার মধ্য দিয়ে দর্শনের ও দার্শনিক চিন্তা ভাবনা কে নানা আঙ্গিকে বোঝার এবং লেখার মাধ্যমে আপনাদের সকলের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এই পত্রিকার ছোট্ট পরিসরে স্থান পেয়েছেন বেদ, উপনিষদ, ভারতীয় দর্শন, ধর্ম, জন্মান্তরবাদ, গৌতম বুদ্ধের বানী, জৈন দর্শন, সময়কালীন ভারতীয় দার্শনিক যেমন - রবীন্দ্রনাথ, মানবেন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দের নৈতিক চিন্তা ধারা, মানবতাবাদ এবং পরিবেশ চিন্তাভাবনা ও তাদের মধ্যে তুলনামুলক আলোচনা।

আমরা প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই দর্শন পরিবারের সকল সহপাঠীদের এবং মহাবিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাগনকে যাদের চিন্তা ধারা তাঁদের লেখার মাধ্যমে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আমরা আপ্লুত তাঁদের এই সহযোগিতায়। আশা রাখি ভবিষ্যতেও তাঁরা আমাদের পাশে এইভাবে থাকবেন ও নিরন্তন উৎসাহ দিয়ে যাবেন। পত্রিকাটি রূপায়ণের জন্য নিরন্তর উৎসাহ দিয়েছেন আমাদের কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা মাননীয়া ড. নাতাশা দাশগুপ্ত মহাশয়া, বিভাগীয় প্রধান কল্পিতা নন্দী ও বিভাগীয় অধ্যাপিকা গন ড. অনুরাধা চট্টোপাধ্যায়, পায়েল কুণ্ডু ও নাজনিন ই ফিরদৌস।

আমরা আশা রাখি আমাদের এই সম্মিলিত ক্ষুদ্র প্রয়াস আপনাদের সকলকে আনন্দ দেবে।

<u>সম্পাদক মন্ডলী</u>

বিপাশা মন্ডল 4th Semester

অন্তরা দাস 4th Semester

স্বাতী চ্যাটার্জী 4th Semester

প্রিয়াঙ্কা পাল 2nd Semester

সৌমি আচার্য 2nd Semester

সায়নী বিশ্বাস 2nd Semester

EDITORIAL BOARD

BIPASHA MONDAL, 4TH SEMESTER

ANTARA DAS, 4TH SEMESTER

SWATI CHATTERJEE, 4TH SEMESTER

PRIYANKA PAL, 2ND SEMESTER

SOUMI ACHARYYA, 2ND SEMESTER

SAYANI BISWAS, 2ND SEMESTER

ADVISORS

KALPITA NANDI

(ASSISTANT PROFESSOR & HEAD, DEPARTMENT OF PHILOSOPHY)

DR. ANURADHA CHATTAPADHYAY

(ASSOCIATE PROFESSOR, DEPARTMENT OF PHILOSOPHY)

NAZNIN E FIRDAUS

(ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF PHILOSOPHY)

PAYEL KUNDU

(ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF PHILOSOPHY)

CONTENT

1. সুরভী মন্ডল, 6th semester:

দর্শন : ভারতীয় এবং সমকালীন

2. স্বাতী চ্যাটার্জী, 4th semester:

বেদ ও ভারতীয় দর্শন

3. বিপাশা মন্ডল, 4th semester:

উপনিষদ

4. অন্তরা দাস, 4th semester :

ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম

5. রীনা শীল 4th semester:

গৌতম বুদ্ধের বানী ও ধর্ম।

6. বান্টি মীর, 6th semester:

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধর্ম

7. অংকনা দেবনাথ, 6th semester:

বিবেকানন্দের সর্বজনীন ধর্ম

8. বাবলি মীর 2nd semester:

ভারতীয় দর্শনে নীতিবিদ্যা

9. MD. Monirruzaman Sk:

Exploring The Potential of Lab Grown Meat: Sustainability, Ethics and Nutrition

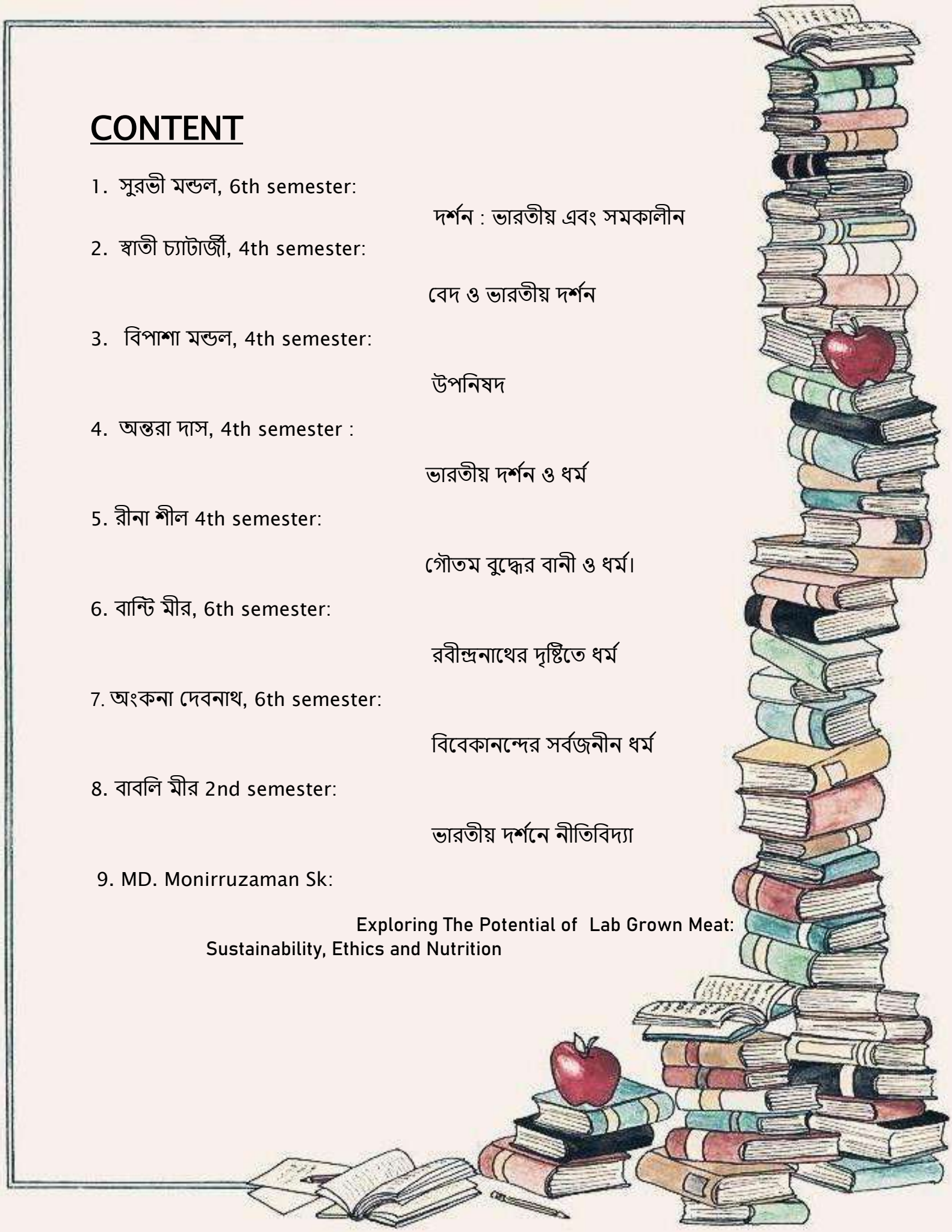

10. স্মৃতি মন্ডল 4th semester:

ভারতীয় দর্শনে পুরুষার্থ

11. তানিয়া সাহা 4th semester:

ভারতীয় দর্শনের জন্মান্তরের স্থান

12.সাবনুর খাতুন 4th semester:

ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ

13. সঞ্চরীতা বিশ্বাস 4th semester:

ভারতীয় দর্শনের আলোকে মোক্ষ

14. সাবনুর খাতুন 2nd semester:

চার্বাক মতে নৈতিকতা

15. রহিমা খাতুন 2nd semester:

বৌদ্ধ দর্শনের নৈতিকতা

16. প্রিয়াঙ্কা পাল 2nd semester

জৈনদর্শনে নৈতিকতার স্থান

17. মাধবী ঘোষ 6th semester:

দর্শনের তত্ত্ব প্রয়োগ

18. মৌনা লাহা (প্রাক্তনী):

ব্যবহারিক বেদান্ত ও বিবেকানন্দ

19. DR. Anuradha Chttopadhyay:

পরিবেশ ভাবনা: একটি পর্যালোচনা

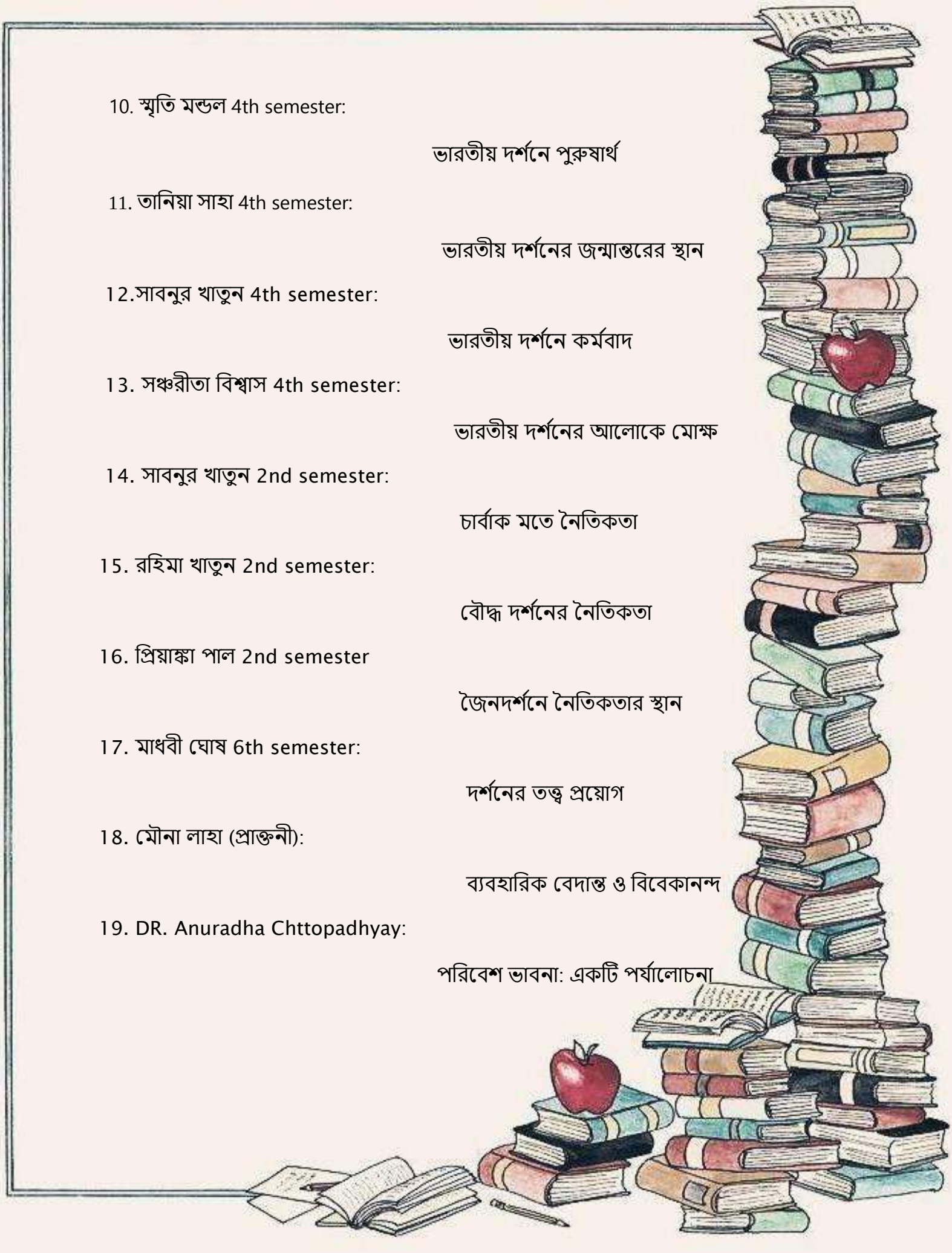

20. Jayasree Mondal:

খোলা চিঠি

21. সায়নী বিশ্বাস, 2nd semester:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাভাবনা

22. তৃষা কর 6th Semester:

রবীন্দ্রনাথের গান ও মানবচেতনা

23. পর্না দেবনাথ 6th semester:

রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ধারায় মানবতাবাদ

24. সৌমি আচার্য 2nd semester

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা

25. অনন্যা বিশ্বাস 6th semester:

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ব্যাখায় মানবতাবাদ

26. সুমন ভট্টাচার্য:

শয়তান সন্দর্ভ

27. ইন্দ্রাণী মণ্ডল

জীবনশৈলী গঠনে বেদান্তযাপন

28. কল্পিতা নন্দী:

মধ্যযুগীয় দর্শন চর্চা: একটি আলোচনা

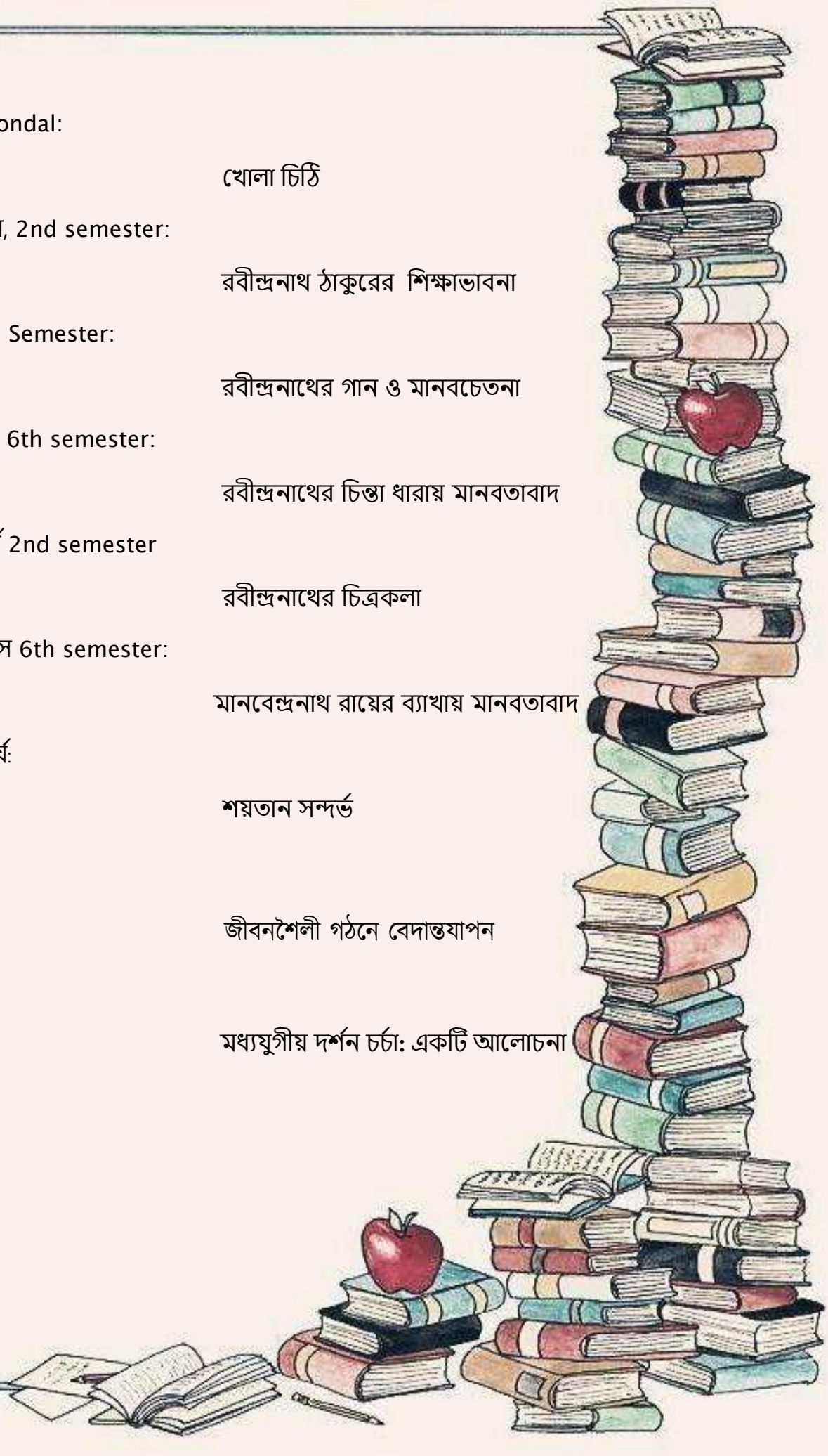

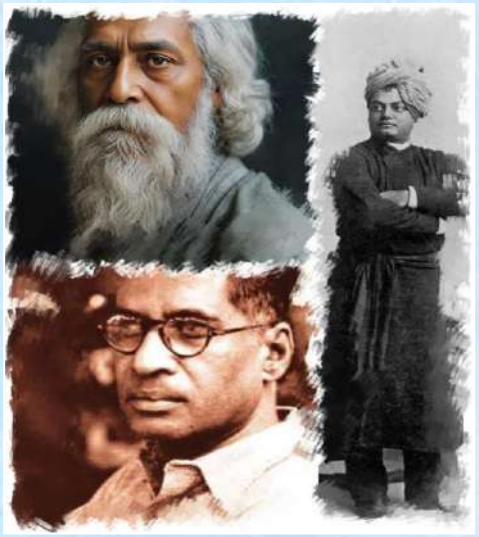

"দর্শন: ভারতীয় এবং সমকালীন"

সুরভীমন্ডল, 6th Semester

ভারতীয় দর্শন বলতে ভারতীয় উপমহাদেশে গড়ে ওঠা দার্শনিক ঐতিহ্যকে বোঝানো হয়। এই দর্শনগুলোতে নানা রকম পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক একাত্মতা লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম ও দর্শনের মাঝে গভীর সংযোগ থাকায় আধ্যাত্মিক পটভূমিকা ভারতীয় দর্শনের একটি বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় দর্শনগুলো ধর্ম, কর্ম, সংসার, পুনর্জন্ম, দুঃখ, ত্যাগ, ধ্যানের মতো অনেকগুলো ধারণা প্রকাশ করে, যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মাকে সংসার ও দুঃখ থেকে চিরমুক্তি (মোক্ষ বা নির্বাণ) লাভ করা। একমাত্র চার্বাক দর্শন ব্যাতিত অপরাপর দর্শনগুলোতে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। জগৎ ব্যাখ্যার চেয়ে জীবন ব্যাখ্যায় অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। এই দর্শনগুলোতে আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে মোক্ষ অর্জনই জীবনের পরম লক্ষ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ অর্জনের মাধ্যমে অত্যন্তিক দুঃখমুক্তিই পুরুষার্থ। তবে আত্মার চৈতন্যের প্রকৃতি এবং দুঃখ মুক্তির চূড়ান্ত পথ কেমন হবে সেই ধারণা সম্পর্কে মত পার্থক্য রয়েছে।

সমকালীন ভারতীয় দর্শন বলতেই আমাদের মনে যাদের কথা আগে আসে তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম। বিবেকানন্দের পথ যোগের, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পথ মানবতাবাদের। বিবেকানন্দ তাঁর কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগের মাধ্যমে মানুষকে মানুষ হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে মানবাত্মার জয়গান গেয়েছেন। অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানবতাবাদের মাধ্যমে মানুষকে জীবনদেবতার স্তরে উন্নীত করে মানবধর্মের সার্বিক সূত্র গ্রন্থনা করেছেন। এই উভয় প্রচেষ্টাই যেন কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের মতো। কলম্বাস যেমন আমেরিকাকে ইউরোপের চক্ষুগোচর করেছেন, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথও তেমনই সমাজ, জাতি, দেশ ও ধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষকেই তাঁদের বিশ্বভাবনার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এছাড়াও সমকালীন ভারতীয় দর্শনের মানবেন্দ্রনাথ রায়, শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, মহাত্মা গান্ধী, স্যার মহম্মদ ইকবাল প্রমুখ প্রখ্যাত দার্শনিকদের কথা জানা যায়। মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর "Science and Philosophy" বইতে দর্শনকে "জীবনের তত্ত্ব" হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।এবং "নতুন মানবতাবাদ" হল মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দেওয়া "বিপ্লবের নতুন দর্শন" যা তিনি তার জীবনের পরবর্তী অংশে বিকশিত করেছিলেন। এছাড়াও ঋষি অরবিন্দ ঘোষের জীবন দর্শন হল আদর্শবাদ, প্রকৃতিবাদ এবং বাস্তববাদের সংশ্লেষণ।

ভারতীয় দর্শন ও সমকালীন ভারতীয় দর্শনের তত্ত্ব, গুরুত,আলোচনা ও চর্চার বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হলেও উভয় দর্শনেই মানব জীবন,মানব সমাজ বা মানব কেন্দ্রীক মতামত বা চিন্তা ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় দর্শন মূলত গোষ্ঠী গত বা সম্প্রদায়গত(বৌদ্ধ, জৈন,ন্যায়)অপরদিকে সমকালীন ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গত নয় ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। তবে ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন হলেও চিন্তা ধারার স্রোত একই দিকে বয়ে গেছে।

বেদ ও ভারতীয় দর্শন

স্বাতী চ্যাটার্জি, 4th Semester

প্রাচীন ভারতের দর্শন সম্প্রদায় প্রত্যক্ষভাবে, ইতিবাচকভাবে অথবা নেতিবাচক ভাবে বেদ - এর দ্বারা প্রভাবিত। ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে বেদ কি তা জানা প্রয়োজন।

'বিদ' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন 'বেদ' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল, 'জ্ঞান - পবিত্র জ্ঞান বা পরম জ্ঞান'। বেদ হল প্রাচীন ভারতের লিপিবদ্ধ একাধিক গ্রন্থের একটি বৃহৎ সংকলন যা ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম নির্দশন এবং সনাতন ধর্মের সর্বপ্রাচীন পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। বেদ কে শ্রুতি সাহিত্য ও বলা হয়। কারন বেদ লিখিত কোনও বই বা পুস্তক আকারে ছিল না। বৈদিক ঋষিরা বেদ মন্ত্র মুখে মুখে উচ্চারণ করে তাদের শিষ্যদের শোনাতে আর শিষ্যরা শুনে বেদ অধ্যায়ন করতেন। তাই সনাতনীরা বেদ কে অপৌরুষেয় এবং নৈর্ব্যক্তিক ও রচয়িতা- শূন্য মনে করেন। সর্বপ্রথম অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, ও অঙ্গিরা এই চার ঋষি চার বেদের জ্ঞান প্রাপ্ত হন।

অধ্যাপক হিরিয়ন্নের অভিমত অনুসারে, বৈদিক সাহিত্যের রচনাকাল আনুমানিক ৬০০ খ্রি: পূর্ব থেকে ২০০খ্রি:পূর্বাব্দের মধ্যকাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

বেদের সংখ্যা চার: ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ।এতে মোট মন্ত্র সংখ্যা ২০৩৭৯টি।প্রত্যেকটি বেদ আবার চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত: সংহিতা (মন্ত্র ও আশীর্বচন), ব্রাহ্মণ (ধর্মীয় আচার, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও যজ্ঞাদির) উপর টীকা;আরন্যক (ধর্মীয় আচার, ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম, যজ্ঞ ও প্রতীকী যজ্ঞ) ও উপনিষদ (ধ্যান, দর্শন, আধ্যাত্মিক জ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা)। কোনও কোনও গবেষক উপাসনা (পূজা) নামে একটি পঞ্চম বিভাগের কথাও উল্লেখ করে থাকেন।

উপনিষদ গ্রন্থ একটি নয় অনেক। মুখ্য তেরটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা গেল :

১. ঐতরেয় 2.বৃহদারন্যক 3.ছান্দোগ্য 4.তৈতরীয় 5.কৌষিতকি 6.কেন 7.ঈশ8.কঠ

9.শেতশ্বতর 10.মুন্ড 11.প্রশ্ন 12.মৈত্রী 13.মান্ডুক্য

ভারতের সমস্ত দর্শন - সম্প্রদায়ের উৎসমূল হল বেদ - এর অন্তর্গত 'মন্ত্র' বা 'সংহিতা' অথবা 'ব্রাহ্মণ'।

উপনিষদ

বিপাশা মন্ডল, 4th Semester

অধ্যাত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার পরাকাষ্ঠা হল উপনিষদ। যে তত্ত্ববিদ্যা অজ্ঞানের নাশ করে জীবকে পরব্রহ্মের সমীপবর্তী করে সেই পরমবিদ্যাই হল উপনিষদ এবং যে গ্রন্থে ওই পরাবিদ্যা থাকে , তাকে বলা হয় 'উপনিষদ সাহিত্য'। উপনিষদে কর্মকান্ডের পরিবর্তে জ্ঞানকান্ডের প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।

উপনিষদ হল বেদের অন্তভাগ। বেদের চরম পরিণতি বা অন্ত্যপরিণতি হচ্ছে উপনিষদ। এখানে চরম অর্থ হল 'অন্ত্য' বা 'শেষ'। বৈদিক চিন্তাধারার পরিপূর্ণ বিকাশ বা চরম পরিণতি উপনিষদেই পাওয়া যায়। বেদ-এর অন্তভাগ (শেষাংশ) হওয়ার জন্য এবং বৈদিক সাহিত্যের চরম উৎকর্ষতার নিদর্শনরূপে গ্রাহ্য হওয়ার জন্য উপনিষদকে 'বেদান্ত' বলা হয়।

বেদের উপনিষদ অংশে বৈদিক যুগের দার্শনিক মতবাদ প্রকাশিত হয়েছে। উপনিষদকে এজন্য 'বেদোপনিষদ'ও বলা হয়। উপনিষদ সংখ্যায় অনেক। এসব বিভিন্ন উপনিষদে আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকেই পরমার্থ সৎ বলা হয়েছে। বেদের দুটি ভাগ হল বেদানুগত ও বেদবিরোধ। এই দুটি ভাগের উপর ভিত্তি করে দুটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে যথা - আস্তিক এবং নাস্তিক। ভারতীয় দর্শনের চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন এরা হল নাস্তিক সম্প্রদায়ভুক্ত। আর মীমাংস, বেদান্ত, ন্যায়, বৈশেষিক , সাংখ্য, যোগ এরা হল আস্তিক সম্প্রদায়ভুক্ত।

উপনিষদে সুক্ষ যুক্তিজালের মাধ্যমে যেসব জটিল পরাতাত্ত্বিক বা আধিবিদ্যক বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে , যথা- আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা , জীব ও জগতের স্বরূপ , জীব-জগৎ-ব্রহ্ম-ঐক্য , কার্যকারণবাদ ইত্যাদি। তার তুল্য আলোচনা বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসেও বিরল। বিশ্বখ্যাত নৈরাশ্যবাদী জার্মান দার্শনিক শোপেনআওয়ার (Schopenhauer) উপনিষদের পরাতাত্ত্বিক আলোচনা পাঠ করে মুগ্ধচিত্তে বলেছেন "It has been the solace of my life ; it will be the solace of my death." আর্থাৎ উপনিষদ আমার দুঃখময় জীবনে শান্তি দিয়েছে , মরণকালেও আমাকে শান্তি দেবে।

ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম

অন্তরা দাস, 4th Semester

'ধর্ম ' শব্দটি ভারতীয় দর্শনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৈদিক বা আস্তিক দর্শনের ধর্ম শব্দটি যে অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে, অবৈদিক চার্বাক ও জৈন দর্শনে সেই অর্থে গ্রহণ করা হয়নি। আবার পাশ্চাত্য দর্শনে 'religion' শব্দটি যে অর্থে গ্রহণ করা হয় বৈদিক দর্শনে সেই অর্থে 'ধর্ম ' শব্দটি গ্রহণ করা হয়না। অবৈদিক দর্শনে ধর্ম বলতে গুন বা বৈশিষ্টকে বলা হয়েছে। ধর্মের বুৎপত্তিগত অর্থ গ্রহণ করলে দেখা যায় বস্তুর ধর্ম। ব্যাক্তি মানুষের ধর্ম সব একাকার। ধৃ-ধাতুর সঙ্গে মন অব্যয় যোগ করলে 'ধর্ম' শব্দটি পাওয়া যায়। ধৃ ধাতুর অর্থ হল ধারণা করা।ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে বা বৈদিক শাস্ত্রে মোট পাঁচটি ধর্মের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি হল - ১.স্বধর্ম ২.সাধারণ ধর্ম ৩.আশ্রম ধর্ম ৪.বিশেষ ধর্ম ৫.বর্ণ ধর্ম। নিম্নে এগুলি সংক্ষিপ্তে আলোচনা করা হল।

১. স্বধর্ম - স্বধর্ম বলতে বোঝায় নিজ ধর্ম। প্রত্যেক ব্যক্তি কোন না কোন বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত। প্রত্যেক বর্ণের ধর্ম ভিন্ন। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ বর্ণের নির্ধারিত কর্ম পালন করবে - এটাই স্বাভাবিক। বর্ণ নির্ধারিত কর্ম পালনই স্বধর্ম পালন করা।

২. সাধারণ ধর্ম - সাধারণ কর্ম পালনের মধ্য দিয়ে যে ধর্ম পালন করা হয় তাহা হল সাধারণ ধর্ম। ভারতীয় শাস্ত্রে পাঁচ প্রকার সাধারণ ধর্মের কথা বলা হয়েছে - ১.অহিংসা ২.সত্য ৩.অস্তেয় ৪.শৌচ ৫.সংযম।

৩. আশ্রম ধর্ম - বৈদিক যুগে মানুষের জীবনকে চারটি আশ্রমে ভাগ করা হয়, যথাক্রমে -১. ব্রহ্মচর্য ২. গ্রাহস্থ্য ৩. বানপ্রস্থ ৪. সন্ন্যাস। প্রত্যেক আশ্রমের জন্য কতকগুলি কর্ম অব্যশিক ভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সেই নির্ধারিত কর্ম পালন হল কর্তব্য কর্ম। এই সমস্ত কর্তব্য কর্ম পালন করাই হল আশ্রম ধর্ম পালন করা।

৪. বিশেষ ধর্ম - বৈদিক ধর্মে স্বধর্মকে বিশেষ ধর্ম বলা হয়। বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিকে কতকগুলি কর্তব্যকর্ম পালন করতে হয়। এইসমস্ত কর্ম সমাজের কল্যাণ ও উন্নয়নএর সহায়ক। প্রত্যেকটি বর্ণের মানুষ নিজ নিজ বর্ণের কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে বিশেষ ধর্ম পালন করে।

৫. বর্ণ ধর্ম - ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই চারটি বর্ণের জন্য নির্দিষ্ট যে সমস্ত কর্তব্য কর্মের উল্লেখ আছে, সেইগুলি বলে বর্ণ ধর্ম।

Epicurus মতাদর্শের একজন দার্শনিক হিসেবে, Lucretius বিশ্বাস করতেন যে, সমগ্র বিশ্বজগৎ পদার্থ ও শূণ্যস্থানের সমন্বয়ে গঠিত এবং সকল জাগতিক ঘটনাকেই প্রাকৃতিক কারণের ফলাফল হিসেবে অনুধাবন করা সম্ভব। Epicurus এর ন্যায় Lucretiusও মনে করতেন যে ভয় ও অজ্ঞতা থেকেই ধর্ম জন্মলাভ করেছে এবং প্রকৃতিজগৎকে কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে অনুধাবনের মাধ্যমেই মানুষ ধর্মের শেকল থেকে মুক্তি পাবে; যদিও, তিনি ঈশ্বরদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। তিনি কখনই ধর্ম কিংবা ধর্মসংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে ছিলেন না; কিন্তু তৎকালীন সমাজের প্রথাগত ধর্মসমূহকে তিনি অন্ধবিশ্বাস হিসেবে দেখতেন কারণ তার মতে সেগুলো এই শিক্ষা দিতো যে, ঈশ্বরগণও প্রাকৃতিক জগতে হস্তক্ষেপ করে থাকেন।ষোড়শ শতকের শুরুর দিকে Niccolo

Machiavelli বলেন:"We Italians are irreligious and corrupt above others... because the church and her representatives have set us the worst example"

Machiavelli এর দৃষ্টিতে ধর্ম ছিল শুধুই একটি হাতিয়ার, যেটি জনমত নিয়ন্ত্রণে ইচ্ছুক শাসকদের খুব কাজে আসে। এছাড়াও আঠারো শতকের অন্যতম প্রোথিতযশা দার্শনিক ও প্রাবন্ধিক David Hume ধর্মের সত্যতার সপক্ষে করা উদ্দেশ্যবাদী বা বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনা যুক্তির সমালোচনা করেন। Hume এর মতে, মহাবিশ্বের সুশৃঙ্খলার কারণ হিসেবে প্রাকৃতিক কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত ব্যাখ্যাই অনেক বেশি যৌক্তিক। ধর্মের দার্শনিক ভিত্তির অযৌক্তিকতা তুলে ধরা ছিল Hume এর সাহিত্যকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও বানী

রিনা শীল, 4th Semester

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য ভাগে হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নগরে শাক্য বংশের এক অভিজাত পরিবারে গৌতম বা সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম শুদ্ধোদন ও মাতার নাম মায়াদেবী। শৈশবকাল থেকেই সিদ্ধার্থর মন ছিল অতি সংবেদনশীল। কিভাবে মানুষের দুঃখ রূপ রোগের নিরাময় সম্ভব, সেই উপায় অনুসন্ধানের জন্য তিনি ২৯ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি 'মধ্যমপন্থা'পথের মাধ্যম অনুসরণ করেন এবং মগধের অন্তর্গত গয়া নগরে এক অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে ধ্যানরত অবস্থায় তাঁর সত্যোপলব্ধি হয়, তিনি দুঃখ - রহস্য উদঘাটন করেন। সত্যের 'জ্ঞান' অর্থাৎ, বোধি লাভের পর গৌতম বা সিদ্ধার্থ 'বুদ্ধ' নামে খ্যাত হন।

বোধি বা সম্যক জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁর কাছে চারটি মহান সত্য'আর্যসত্যচতুষ্টয়' উদ্ভাসিত হয়। যথা –

১. দুঃখ ---- জীবন দুঃখময়, সর্বং দুঃখম্ ।

২. দুঃখ - সমুদায় --- দুঃখের উৎপত্তি আছে , কারণ আছে।

৩. দুঃখ - নিরোধ ---- দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব।

৪. দুঃখ - নিরোধ মার্গ ---- দুঃখ - নিবৃত্তির উপায় আছে।

জীবের দুঃখ মুক্তির জন্য তিনি তাঁর এই বোধিলব্ধ আর্যসত্যের মাধ্যমে অহিংসা, প্রেম ও করুণার বানী প্রচার করেন। তাঁর এই বানী বা উপদেশকে ভিত্তি করেই ধীরে ধীরে এক ধর্ম বা দর্শন গড়ে ওঠে যা বৌদ্ধ ধর্ম বা বৌদ্ধ দর্শন নামে পরিচিত। বৌদ্ধ দর্শনের মূল উৎস হল পালিভাষাই রচিত তিনটি প্রাচীন গ্রন্থ, যথা -- বিনয়পিটক, সূত্তপিটক ও অভিধম্মপিটক। যাদের একত্রে 'ত্রিপিটক' বলা হয়। সর্ব প্রথম তিনি তাঁর এই ধর্ম প্রচার করেন তাঁর পঞ্চবর্গীয় শিষ্যের কাছে এবং পরবর্তী কালে তা ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচারিত হয়। কালক্রমে, এই ধর্ম ও দর্শন ভারতের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হয়ে বিশ্বধর্মে পরিণত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধর্ম

বান্টি মীর, 6th Semester

ধর্ম বরাবরই ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ। ধর্ম ছাড়া ভারতীয় সাধারণ জীবন প্রবাহ সম্ভব এই ভাবনা এখন বিরল। এই সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা বাড়ছে প্রতিদিন। যেখানে রাজনীতি ধর্ম ছাড়া অচল। সেখানে দাঁড়িয়ে বাঙালির গুরু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিতে ধর্মের পরিভাষা কী তা জেনে নেওয়া জরুরী।

শুরুতেই বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথ বেদ-বাইবেল থেকে কোরান শরিফ পর্যন্ত পৃথিবীর সব ধর্মগ্রন্থ পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পড়ে অনুভব করেছিলেন সব ধর্মগ্রন্থ প্রায় একই কথা বলছে — কীভাবে ভালোবাসার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায়। রবীন্দ্রনাথের কাছে ধর্মের পরিভাষা অনেক গভীর এবং অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মতো। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচর্চা অথবা ধর্ম বিষয়ক পড়াশোনা শুধু হয়েছিল ছোটবেলাতেই। তার পিতার হাত ধরে।দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পুত্রদের বেদ এবং উপনিষদের শ্লোকগুলো আবৃত্তি করাতেন। রবীন্দ্রনাথের বাবা ছিলেন ব্রাহ্ম আন্দোলনের পুরোধা। এছাড়া রাজা রামমোহন রায়ের অনুরাগী। মাত্র ২৩ বছর বয়সে ব্রাহ্ম সমাজের সেক্রেটারি পদে নিয়োগ করা হয় রবীন্দ্রনাথকে।

"মানুষের ধর্ম" বইতে রবীন্দ্রনাথ মানুষের ভিতর দুরকম ধর্মের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। প্রথমটি নিতান্ত প্রাকৃতিক তথা জৈব ধর্ম, যে ধর্মে শারীরিক প্রয়োজনই সব। আর দ্বিতীয়টি হলো জীবসত্তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে মানবধর্মের জাগরণ হওয়ার ফলে প্রাণীজগতের স্বভাবধর্ম থেকে মানুষের ধর্মে উত্তরণ ঘটে মানবজাতির। অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারছি প্রাণীর ধর্ম শরীর হইতে মন সর্বত্র বিরাজমান।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধর্ম মানুষকে অনেক কিছু শেখায়। সেই জ্ঞান যদি আমরা উপভোগ করতে পারি তাহলে শান্তি, একতা এবং ভালোবাসার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক হয়ে উঠবে ভারতবর্ষ।

বিবেকানন্দের সার্বজনীন ধর্ম

অংকনা দেবনাথ, 6th Semester

বিবেকানন্দ বলেছেন: ধর্মই মানবের চিন্তা ও জীবনের সর্বোচ্চ স্তর; প্রত্যেক ধর্মই তার নিজ নিজ মতবাদ উপস্থিত করে সেই গুলিকে একমাত্র সত্য বলে বিশ্বাস করেন।

(১) সকল ধর্মই মানুষকে ঈশ্বর বিমুখ করার চেষ্টা করে: -

প্রত্যেক সম্প্রদায়- প্রত্যেক ব্যাক্তি- প্রত্যেক জাতি- প্রত্যেক ধর্ম জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে উর্ধ্বগামী হয়ে ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়ারই চেষ্টা করেছেন। বিবেকানন্দের ধর্ম সমন্বয় বিষয়ক এই সকল উক্তি হতে স্পষ্ট বোঝা যায়। ধর্ম সমন্বয় সুবোধ্য বা সুসাধ্য নয়। ধর্ম সমূহের সূক্ষ্ম, স্থূল ও মূলে- অর্থাৎপৌরাণিক অংশ, দার্শনিক তত্ব ও ঐক্য বা সমন্বয় লাভ কঠিন। আরও গভীরে গিয়ে উপাসনা এবং উপাসনার উদ্দেশ্যে ও ফলকে ধরে একপ্রকার সমন্বয় বা ঐক্যলাভ করা যেতে পারে।

(২) আমাদের মন ও ধারণা শক্তি অনুসারে ঈশ্বরের ধারণা: -

বিভিন্ন প্রকার উপাসনার উদ্দেশ্যে ও অবলম্বন করে যে ঐক্য বা সম্বনয় অর্থাৎ সাদৃশ্য তা অতি সুন্দর উপমার দ্বারা বোঝাতে বিবেকানন্দ বলেছেন: "মনে করুন, আমরা সকলেই পাত্র নিয়ে একটি জলশয় থেকে জল আনতে গেলাম। কারও হাতে বাটি, কারও হাতে কলসি,কারও বা হাতে বালতি ইত্যাদি। এবং আমারা নিজ নিজ পাত্রগুলি ভরে নিলাম"। তখন বিভিন্ন পাত্রের জল স্বভাবতই আমাদের নিজ নিজ পাত্রে আকার ধারণ করবে। কিন্তু প্রত্যেক পাত্রেই জল ব্যাতিত অন্য কিছু নেই। ধর্ম সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। আমাদের মন পাত্রের বিভিন্নতা বৈচিত্র্য হেতু মানুষের ঈশ্বরের ধারণা, উপাসনার প্রনালী বা ধর্মীয় ধারণা বিভিন্ন প্রকার হলেও যেহেতু ঈশ্বর অদ্বিতীয় এবং সর্বত্রই এক। সকল ধর্ম ও উপাসনা জ্ঞাতসার বা অজ্ঞাতসার তার দিকেই অগ্রসর হয়েছে। ছোট - বড় সমস্ত ঈশ্বর ধারণা মানবকে উর্ধ্বগামী করে থাকে।

(৩) ধর্ম বা উপাসনা ধ্বংসাত্মক নয়: -

সব ধর্মই সেই ধর্মাবলম্বীদের ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। বিবেকানন্দ বলেছেন, যতক্ষন মানুষ অকপট থাকে ততক্ষন তার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কিছু বলা উচিত নয়। আমরা প্রত্যেকেই একটি বৃত্তের বিভিন্ন ব্যাসার্ধ দিয়ে সেই কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হই। কেন্দ্রে পৌঁছালে আমাদের সকল বৈষম্য দূর হয়। ধর্মই পরমতত্বের দিকে মানবজাতিকে অগ্রসর করে, তাই সকলের গ্রহণযোগ্য কোনো ধর্ম বা দর্শন না থাকলেও বিভিন্ন ধর্মের মতে বৈষম্য থাকলেও ওই বৈষম্যের মধ্যে ত্রকত্বের অনুসন্ধান করে বিদ্বেষ,ঘৃনা ত্যাগ করে স্ব স্ব ধর্মে নিষ্ঠা যুক্তথাকতে হবে।

(৪) সর্ব ধর্ম সমন্বয়: - জগতের প্রধান প্রধান ধর্মগুলি প্রত্যেকটি পূর্ণ সত্যকে আংশিকভাবে প্রকাশ করে মাত্র। প্রত্যেক ধর্মের পশ্চাতে একটি সার বস্তু আছে, তারা পরস্পরের বিরোধী নয়, তারা পরস্পরের পরিপূরক। বিবেকানন্দের মতে যে ধর্মের যে অংশ মুখ্য তাৎপর্য, যা তার প্রধান উদ্দেশ্য সেই অংশেই তার প্রামাণ্য। অপর অংশগুলি গৌন বিষয়ের বা লৌকিক ভ্রান্ত মতের অনুবাদ মাত্র। সুতরাং ধর্মের মুখ্য তাৎপর্য অবশ্য গ্রহণীয়।

ভারতীয় দর্শনে নীতিবিদ্যা

বাবলি মীর, 2nd Semester

ভূমিকা:-

নীতি শাস্ত্র বা নীতিবিদ্যা হলো মানুষের চরিত্র অথবা চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ আচরণের ভালত্ব ও মন্দত্ব সংক্রান্ত বিজ্ঞান। পাশ্চাত্যের নীতিবিদ্ ম্যাকেঞ্জি নীতিবিদ্যার সংজ্ঞায় বলেছেন, নীতিবিদ্যা হলো মানুষের আচরণ ঔচিত্য বা ভালত্বের আলোচনা। অধ্যাপক লিলি বলেছেন, নীতিবিদ্যা হলো সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ সম্বন্ধীয় এমন এক আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান যেখানে মানুষের আচরণ উচিত না অনুচিত ভালো না মন্দ অথবা অনুরূপ বিচার করা হয়। ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি সংশ্লেষণাত্মক বা আশ্লেষণী। ভারতীয় দর্শনের প্রায় সকল শাখায় তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক উভয় দিকের প্রতি সমান গুরুত্ব দিয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শন কেবল সত্যের অনুসন্ধান ,জ্ঞানের জন্য জ্ঞান অন্বেষণ।ভারতীয় দর্শন কেবল সত্যের অনুসন্ধান নয় , জীবনে সত্যের প্রতিষ্ঠাও। ভারতীয় দার্শনিকের কাছে দর্শন কেবল তত্ত্বচর্চা নয়, জীবনচর্যাও। যে তত্ত্বচর্চার সঙ্গে জীবনচর্যার কোন যোগ নেই, ভারতীয় দর্শনে তা অসার ও নিষ্ফলরূপে পরিত্যক্ত হয়েছে। যথাযোগ্য জীবন -যাপনের জন্য সত্যজ্ঞানের প্রয়োজন। তত্ত্ব জ্ঞানের আলোকে জীবনকে সত্য সুন্দর ও কল্যাণময় করাই হলো ভারতীয় দার্শনিকের অভীষ্ট।

এখানে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি সঙ্গে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান পার্থক্য। পাশ্চাত্যের তত্ত্বজ্ঞান দার্শনিকের জীবনকে তেমন প্রভাবিত করে না, সেখানে তত্ত্বকে জানাই হল দার্শনিকের অভীষ্ট। পাশ্চাত্যের দার্শনিককে যদি জ্ঞানী বলা হয়, তাহলে ভারতীয় দার্শনিককে বলতে হয় 'সত্যদ্রষ্টা ঋষি', যিনি তার জ্ঞানের আলোকে জীবনকে রূপায়িত করেন। ভারতের বিভিন্ন দর্শন শাখার সমর্থক তাদের নিজ নিজ সত্যজ্ঞানের আলোকে জীবনকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেন - জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক, বৈদান্তিক প্রভৃতি দার্শনিকগণ তাদের নিজ নিজ সত্য উপলব্ধি অনুসারে জীবনযাত্রা প্রণালী নির্বাহ করেন এবং ওই প্রকার জীবনযাত্রা নির্বাহের সঙ্গেই তারা ইষ্ট - অনিষ্ট,ভালো-মন্দ ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি নৈতিক বিশ্লেষণকে যুক্ত করেন। স্পষ্টতই ,ভারতীয় নীতিশাস্ত্র একই সঙ্গে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক। সমন্বয়ী বা আশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ভারতীয় দার্শনিক নীতি, ধর্ম ইত্যাদিকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেননি, দর্শনের অঙ্গীভূত রূপে আলোচনা করেছেন। নৈতিক ভালো মন্দের আলোচনা তত্ত্বালোচনার মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেন নি-নৈতিক আলোচনার সঙ্গে আদিবিদ্যাক আলোচনা ,আধ্যাত্মিক আলোচনাও যুক্ত হয়েছে। এর ফলে নৈতিক, পরমার্দশ সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যে তেমন কোন মতভেদ দেখা দেয়নি। ভারতীয় ধ্যান-ধারণা অনুসরণ করে সমাজে নৈতিক আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে নৈতিক ভালো-মন্দের বিচারের সঙ্গে আধ্যাত্মিক দিকটিকেও যুক্ত করে বলতে হবে, মানুষের যে কাজ তার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভের সহায়ক তা ভালো বা উচিত কাজ এবং যে কাজ তার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভের অন্তরায় তা মন্দ বা অনুচিত কাজ ।

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য:

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের এমন কতগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য তাকে পাশ্চাত্যের নীতিবিদ্যা থেকে সহজে ভিন্ন করা চলে তবে, উভয় ক্ষেত্রে মানুষের আচরণের নৈতিক বিচার, আলোচ্য বিষয়

হওয়ায় তাদের মধ্যে তেমন ভিন্নতা আছে তেমনি অভিন্নতা আছে। অর্থাৎ ভারতীয় নীতিশাস্ত্র ও পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যা যেমন দুটি বিপরীত মেরুর বিরুদ্ধে ধর্মী নৈতিক মতবাদ নয়, তেমনি আবার তারা সব ব্যাপারে অভিন্ন মতবাদ ও পোষণ করে না। পাশ্চাত্যে নীতিবিদ্যার সঙ্গে ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের পার্থক্য নির্দেশ করতে হলে ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে হয়। যথা-

১) প্রাচীনতা।

২) ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গি ।

৩) আধিবিদ্যক ভিত্তি ।

৪) নিরপেক্ষতা।

প্রথমত, মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভারতীয় নীতিদর্শনই প্রাচীনতম। নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বেদ-উপনিষদই জগতের প্রাচীনতম সাহিত্য এবং ভারতীয় দর্শনের তথা নীতি দর্শনের ভিত্তিভূমি হল বেদোপনিষদ। হিন্দুশাস্ত্রসমূহের এবং মীমাংসার সুসংহত নৈতিক মতবাদের মূল হল প্রাচীন ভারতের বেদ এবং উপনিষদ।

দ্বিতীয়ত, ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের এই প্রাচীনতার জন্যই নৈতিক মতবাদ গুলি ভারতবাসীর ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়েছে - চর্চার সঙ্গে চর্যাও যুক্ত হয়েছে। ভারতীয় নীতি শাস্ত্রের এই ব্যবহারিক দিকটি পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যায় উপেক্ষিত হয়েছে। পাশ্চাত্যের নীতিবিদ্যা মূলত জ্ঞানাত্মক, যেখানে নৈতিক প্রত্যয়গুলির স্পষ্টীকরণ করা হয়। পাশ্চাত্যের নীতিবিদ্যায় জ্ঞানচর্চায় মুখ্য, জীবনচর্যা উপেক্ষিত। ভারতীয় নীতিশাস্ত্র এমন নয়। ভারতীয় নীতিশাস্ত্র মানুষকে কেবল নৈতিক জ্ঞানের সমৃদ্ধ করে না , সেই সঙ্গে নীতিনিষ্ট হবার জন্য বিশেষ ধরনের জীবনচর্যা কেও অনুসরণ করতে বলে। ভারতীয় নীতিশাস্ত্র তাই জ্ঞান এবং কর্মের ওপর , তত্ত্ব ও প্রয়োগের ওপর , চর্চা ও চর্যার ওপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়।

তৃতীয়ত, ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল আধিবিদ্যক ভিত্তিভূমি। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন সরূপ ভগবদগীতার ভিত্তিভূমিও হল, আধিবিদ্যাক পরমাত্মা ঈশ্বর, এবং জীবাত্মা ওই পরমাত্মারই প্রকাশ।

চতুর্থত, আধিবিদ্যক আধ্যাত্মিক তত্ত্বযুক্ত হওয়ার ফলে ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে নৈতিক পরমার্থ সম্পর্কে সকলেই অভিন্ন মত পোষণ করেন। পাশ্চাত্যে নীতিবিদ্যার সঙ্গে অধিবিদ্যার তেমন যোগ না থাকায় সেখানে নৈতিক জীবনের পরমার্দশ সম্পর্কে সকলে অভিন্ন মত পোষণ করেন না। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রবিদদের মতে , নৈতিক জীবনের লক্ষ্য ব্যবহারিক জীবনের বৈভব বা ঐশ্বর্য নয় , দৈহিক সুখ -স্বাচ্ছন্দ নয় তা হল আত্মিক বা আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ, বা মোক্ষপ্রাপ্তি।

Exploring the Potential of Lab-Grown Meat: Sustainability, Ethics, and Nutrition

Dr. Md Moniruzzaman Sk
Assistant Professor & Head of the Department
Department of Chemistry
Krishnagar Women's College

Lab-grown artificial meat, also known as clean meat or cultured meat, is a revolutionary advancement in culinary technology. By cultivating animal cells in a nutrient-rich environment, muscle tissue is grown, mimicking the natural process that occurs inside animal bodies. This innovative approach has great promise for addressing the various challenges associated with conventional meat production. One of the key factors influencing the development of lab-grown meat is its potential to reduce the environmental impact of conventional animal husbandry. Artificial meat production has the potential to greatly reduce land use, water consumption, and greenhouse gas emissions in comparison to traditional meat production, which is resource-intensive and greatly increases greenhouse gas emissions. This offers a more sustainable option that may help mitigate the impact on ecosystems and contribute to the effort to combat climate change.

Furthermore, cultured meat may be able to resolve moral issues pertaining to animal care. Animals must only have a tiny amount of their cells harvested for the procedure to be carried out without endangering the animals. This is in sharp contrast to commercial animal husbandry methods, which frequently subject the animals to cramped, stressful environments before to slaughter. Lab-grown meat is considered by followers of animal rights and welfare as a more compassionate choice. Artificial meat can be made to have a higher nutritious content than traditional meat products. By altering the growth medium's composition, researchers can maximize nutritional content by lowering harmful lipids and increasing beneficial elements. This

alteration could result in meats that are higher in vitamins, minerals, and other nutrients while also having less saturated fat.

However, there are challenges involved in producing and approving lab-grown meat in terms of price. The procedure is currently expensive since it requires desired growth media, bioreactors, and other equipment. Proactively, companies and researchers are looking to optimize production procedures in order to cut costs. Two further significant factors influencing. One of the main challenges is raising output to the point where cultured meat can rival regular meat the development of artificial meat are consumer and regulatory acceptance of it. While many customers are enticed to lab-grown meat due to its potential health benefits, others may be cautious due to uncertainty, flavor, or safety concerns. It will be necessary to dispel these myths through education and clear communication in order to achieve widespread adoption.

To sum up, lab-grown artificial meat has great potential to replace traditional meat production in a way that is ethical, sustainable, and possibly even healthier. Even though there are still obstacles to be solved, continued research and technical developments keep making this novel technique more feasible and scalable. If cultured meat is effectively introduced, it has the potential to completely transform the way we raise and eat meat, providing a future option for more compassionate and ecologically friendly food.

ভারতীয় দর্শনে পুরুষার্থ

স্মৃতিমন্ডল, 4th Semester

পুরুষার্থ:

কাম্যবস্তু মনে করে মানুষ যাকে কামনা করে সেটাই মানুষের জীবনে পুরুষার্থ। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে মানুষের প্রয়োজন সাধক চারটি কাম্য বস্তুর অর্থাৎ পুরুষার্থের -(১)ধর্ম (২)অর্থ (৩)কামও (৪)মোক্ষের উল্লেখ করা হয়েছে।

১. (ধর্ম) : যা ধারণ করে তাই ধর্ম। বেদ উপনিসদে 'ধর্ম 'কে এক অলঙঘনীয় নিয়ম রূপে গণ্য করা হয়েছে, যার দ্বারা বিশ্বজগত পরিচালিত হয় এবং জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়। ভারতীয় চিন্তা ধারায় ধর্মকে বা সৎকর্মকে পরিত্যাগ করে জীবনের কোনো অভীষ্টই লাভ করা যায় না। স্বতঃ মূল্যবান পুরুষার্থ 'মোক্ষো ' লাভের আবশ্যিক উপায় হিসেবেই 'ধর্ম' প্রয়োজনীয়।

(২). অর্থ : জীবনকে যাপনযোগ্য করার জন্য অর্থের যে প্রয়োজন আছে একথা ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে অস্বীকার করা হয়নি। অর্থ স্বতঃমূল্যবান পদার্থ নয়। অর্থ পরতঃ মূল্যবান, অপর দুটি পুরুষার্থ কাম সাধনের ও ধর্ম পালনের জন্য অর্থ কে কামনা করা হয়।

(৩). কাম : বাস্তবমুখী ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে মানুষের জীবনে দৈহিক সুখ সম্ভোগকেও প্রয়োজনীয় বলা হয়েছে এবং কামের পরিচর্যার জন্য, দাম্পত্য রতির জন্য গৃহস্থ আশ্রমের উল্লেখ করা হয়েছে।

(৪). মোক্ষ : ভারতীয় ধর্ম শাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রে যারা শ্রেয়কে প্রেয় অপেক্ষা বেশি কাম্য বলেন তারা চতুর বর্গ পুরুষার্থের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উল্লেখ করে 'মোক্ষ'কেই পরম পুরুষার্থ বলেন। যাকে লাভ করলে আর কিছু কামনা করার থাকে না সব প্রয়োজনের অবসান ঘটে তাই হলো পরমপুরুষার্থ। মোক্ষ লাভের পর পুরুষের অর্থাৎ আত্মার আর কিছুই কামনার থাকে না।

ভারতীয় দর্শনে জন্মান্তরবাদের স্থান

তানিয়া সাহা, 4th Semester

ভারতীয় দর্শনটির বাস্তব সম্মত রুপটিই কিন্তু, শক্তির অবিনশ্বরবাদ, "শক্তি একরুপ থেকে অন্যরুপে পরিবর্তন হয় মাত্র,যার প্রকৃতভাবে সৃষ্টি বা ধংস নেই"প্রতিটি পরিবর্তনেই নতুন জন্ম হয়, এবং পূর্বের প্রকৃতির মৃত্যু ঘটে। এটাই মূলত জন্মান্তরবাদ। প্রতিটি জীব তার কৃতকর্মানুসারেই নতুন জন্মের ও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করে।শ্রীমদ্ভগবদগীতা এই পরিবর্তনকেই জগতের নিয়ম হিসাবে দেখিয়েছে। জীবের স্থুল ও সুক্ষ শরীর সবই কিন্তু পরিবর্তনশীল।

বৈশিষ্ট্য:ভারতীয় দর্শনে জন্মান্তরবাদের ধারণার বৈশিষ্ট্য হলো এটা কর্মবাদের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ কর্মবাদ স্বীকার করলে তার পরিণাম হিসেবেই জন্মান্তরের ধারণাকে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু কেন? কর্ম ও কর্মফলের ধারণাকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য জন্মান্তরের প্রয়োজন পড়ল কেন?

ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে যাদেরই মোটামুটি ধারণা আছে তাঁরা এই প্রশ্নের উত্তর জানেন, কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে-বিশিষ্ট ভারতীয় দার্শনিক তথা সংস্কৃতজ্ঞ মহীশূর হিরিয়ান্না তাঁর "The Essentials of Indian Philosophy" বইতে লিখেছেন— কর্মবাদ একটি কর্মের নেপথ্যের কারণগুলিকে সেই কর্মের কর্তার মধ্যে চিহ্নিত করে। কিন্তু যেহেতু সেই কারণসমূহকে মাত্র একজন্মের সংকীর্ণ পরিসরে পাওয়া সম্ভব নয়, সেহেতু কর্মবাদ সংসার তথা পুনর্জন্মের মাধ্যমে (জীব)আত্মার কর্মফল ভোগের ধারণার অবতারণা করে । সুতরাং জন্মান্তরের তত্ত্ব কর্মবাদের একটি আবশ্যিক পরিণতি ।কিন্তু এর পরেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে একজন্মেই কেন কর্মের সমস্ত কারণ চিহ্নিত করা যেতে পারেনা, অথবা সমস্ত কর্মের ফল ভোগ করা যেতে পারেনা? এলিয়ট ডয়েচ (Eliot Deutsch) তাঁর বই "Advaita Vedanta: A Philosophical Reconstruction" বইতে এর একটা বিচক্ষণতাপ্রসূত কারণ দেখানোর চেষ্টা করেছেন—

উপনিষদীয় মুনি-ঋষিরা জানতেন যে আত্মান্বেষণের জন্য কেবল প্রস্তুত হতেই যে অধিকাংশ মানুষকে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয় শুধু তাই নয়, আত্মানুসন্ধানের এই প্রয়াসে ব্যর্থ হওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে । বেশিরভাগ মানুষের জন্যই একজন্মে মোক্ষলাভ সম্ভব বলে মনে হয়নি তাঁদের। তাহলে শিষ্যদের বিফলমনোরথ হওয়া কীভাবে আটকানো যায়? কর্মবাদের মাধ্যমে এই সমস্যার সরাসরি সমাধান সম্ভব। যে কর্মের ফল এই জন্মে পাওয়া সম্ভব নয়, তা পরজন্মে পাওয়া যাবে।

জন্মান্তরবাদ কি যাচাইযোগ্য? জাতিস্মরদের বক্তব্যকে যদি গণনাযোগ্য বলে মেনেও নিই, সেক্ষেত্রেও প্রশ্ন থেকে যায় যে এতে কর্মফলের ধারণা প্রমাণ হয় কিনা। কারণ কর্মের ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করা না গেলে ভারতীয় দর্শনের পরিসরে জন্মান্তরের ধারণা অর্থপূর্ণ হবে না। আপাততকেবল এটুকুই বলা যেতে পারে যে অকাট্য প্রমাণ থাক বা না থাক, কর্ম ও জন্মান্তরবাদের ধারণা ভারতীয় ধর্মদর্শন তথা মননকে অনুধাবন করার জন্য অপরিহার্য।

ভারতীয় দর্শনের কর্মবাদ

সাবনুর খাতুন, 4th semester

কর্মবাদ একপ্রকার নৈতিক কার্যকারণবাদ। বাহ্যজগতের কার্য- কারণ নিয়মকে নৈতিক জগতে কার্যপ্রয়োগ করে তাকেই 'কর্মনীতি' বলা হয়েছে।কর্মবাদের সার কথা হল-জীবনে সুখ দুঃখ ভোগ কর্মের ইফল। কর্ম কারণ, সুখ দুঃখ ভোগ কার্যফল।কর্মবাদকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়।যথা- ১. স্বকাম কর্ম, এবং ২ . নিষ্কাম কর্ম। স্বকাম কর্ম: যে কর্ম কোন ফল লাভের আশায় করা হয়, তখন তাকে স্বকাম কর্ম বলা হয়।যেমন পরীক্ষার প্রস্তুতি।নিষ্কাম কর্ম: যে কর্ম কোন ফল লাভের আশায় করা হয় না, তাকে নিষ্কাম কর্ম বলা হয়। স্বকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্মের পার্থক্য:

১.যে কর্ম উদ্দেশ্যমুখী,যে কর্ম কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপয় হিসেবে কৃত হয় , তা স্বকাম কর্ম।

কিন্তু,যে কর্ম লাভ- অলাভ বা অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে সাধিত হয় না,তা নিষ্কাম কর্ম।

২.স্বকাম কর্মের স্থলে থাকে কামনা - বাসনা। স্বকাম কর্মী কামনা - বাসনা দ্বারা তাড়িত হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু,নিষ্কাম কর্মের মূলে কোন কামনা - বাসনা থাকে না।

ভারতীয় দর্শনের আলোকে মোক্ষ

সঞ্চরিতা বিশ্বাস, 4th semester

ভারতীয় দর্শনে চতুর্থ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ হল মোক্ষ। মোক্ষ শব্দটির সমার্থক শব্দ হিসাবে "মুক্তি", "নির্বাণ", "অপবর্গ", "নিঃশ্রেয়স", ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়। মোক্ষ হল জীবনের পরম প্রাপ্তি, যাবতীয় শুভ কর্মের শেষ পরিণতি। ঋষি অরবিন্দ বলেছেন-"মোক্ষ ভারতীয় দর্শনে এক অসাধারণ প্রত্যয়। দর্শনের লক্ষ্য দূরকল্প কিছু নয়,বরং জাগতিক জীবনের সীমাবদ্ধতা এবং ফলশ্রুতি স্বরূপ উৎপন্ন দুঃখ থেকে মুক্তি।" জৈন দার্শনিকদের মতে, মোক্ষ লাভের জন্য সঞ্চিত কর্মের চিরতরে যে বিমুক্তি তাই মোক্ষ। কর্মপুদগল থেকে জীবপুদগলের বিমুক্তিই মোক্ষাবস্থা।

বৌদ্ধ মতে, আত্মা যে নিত্য স্থির -সেই মত স্বীকৃত নয়। কিন্তু দেহান্দ্রিয়াদি সংঘাতের অতিরিক্ত কর্তৃত্বাদি, ভোক্তৃত্বাদিরপ্রযোজক একরকম সমুদায় বা সংঘাত স্বীকৃত, এই সংঘাতেরই জন্ম মরণ স্বীকৃত। এই জন্ম মরণ প্রবাহ হল বদ্ধ দশা,ফলে সেই প্রবাহ থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হতে পারলেই মুক্তি।

ন্যায় -বৈশেষিক মতঃন্যায় বৈশেষিকদের বস্তুবাদী দর্শনিক বলা হয়েছে, মোক্ষ মানে অস্তিত্বের অবলুপ্তি নয়, বরং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। তাই মোক্ষলাভে দুঃখের পুনরাবির্ভাব আর কোনভাবেই সম্ভব নয়।

সাংখ্য-যোগ মতঃএই দুটি দর্শনেই বলা হয়েছে মোক্ষ হল সমস্ত ধরনের দুঃখের হাত থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি এবং দুঃখের পুনরাবির্ভাবের যাবতীয় সম্ভাবনার অবলুপ্তি।

মীমাংসক মতঃ মীমাংসক যজ্ঞাদি-কর্মের জন্য যে নিত্য সুখ প্রাপ্তি তাকেই মোক্ষ বলে স্বীকার করেন। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, সেই সুখ যদি নিত্য হয় তাহলে তো তা বদ্ধ অবস্থাতেও থাকবে। মীমাংসকগণ বলেন সুখ সর্বদাই রয়েছে।কোনও কারনে তা অনভিব্যক্ত ছিল; কোনো প্রতিবন্ধকের জন্য। জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা সেই প্রতিবন্ধক দূর হলেই নিত্য সুখ রূপ মোক্ষের অভিব্যক্তি সম্ভব।

অদ্বৈতবেদান্ত মতঃ অদ্বৈতবেদান্ত মতে, মোক্ষ হল নিত্য আনন্দের প্রকাশক এবং মোক্ষ এই জীবনেই লাভ করা সম্ভব এবং নিষ্কাম কর্মের সঙ্গে তা কখনোই অসংগতিপূর্ণ নয়। শ্রবণ,মনন, নিদিধ্যসনের সাহায্যে মেঘমুক্ত সূর্যের ন্যায় নিত্য প্রকাশ জ্যোতি স্বরূপ আত্মা বন্ধন মুক্ত হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞানই মুক্তির উপায়।

বিশিষ্টাদ্বৈত মতঃরামানুজ প্রতিষ্ঠিত বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত ঘোষণা করে যে, মানুষের মোক্ষলাভে ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার বোধ লাভ হয় না। রামানুজের মতে মুক্তি জীবাত্মার এক আনন্দঘন অবস্থা। ঈশ্বরের করুণা ছাড়া মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। লক্ষ্যণীয় যে, ভারতীয় দর্শনে ধর্ম,অর্থ,কাম এবং মোক্ষ-কে পুরুষার্থ বলে গণ্য করা হয় যেহেতু, এগুলো সব মানুষের মধ্যে বর্তমান, সুখ লাভের ও দুঃখ পরিহারের মৌল ইচ্ছা তারই চরিতার্থতা ঘটায়। চতুর্বর্গ পুরুষার্থের প্রথম তিনটি প্রবৃত্তি মার্গের অধীন, একমাত্র মোক্ষ নিবৃত্তি মার্গের অধীন।

অদ্বৈতবেদান্ত মতে , মোক্ষ হল নিত্য আনন্দের প্রকাশক এবং মোক্ষ এই জীবনেই লাভ করা সম্ভব এবং নিষ্কাম কর্মের সঙ্গে তা কখনোই অসংগতিপূর্ণ নয়। শ্রবণ,মনন, নিদিধ্যসনের সাহায্যে মেঘমুক্ত সূর্যের ন্যায় নিত্য প্রকাশ জ্যোতি স্বরূপ আত্মা বন্ধন মুক্ত হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞানই মুক্তির উপায়।

বিশিষ্টাদ্বৈত মত, রামানুজ প্রতিষ্ঠিত বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত ঘোষণা করে যে, মানুষের মোক্ষলাভে ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার বোধ লাভ হয় না। রামানুজের মতে মুক্তি জীবাত্মার এক আনন্দঘন অবস্থা। ঈশ্বরের করুণা ছাড়া মোক্ষলাভ সম্ভব নয়।

লক্ষ্যণীয় যে, ভারতীয় দর্শনে ধর্ম,অর্থ ,কাম এবং মোক্ষ-কে পুরুষার্থ বলে গণ্য করা হয় যেহেতু, এগুলো সব মানুষের মধ্যে বর্তমান, সুখ লাভের ও দুঃখ পরিহারের মৌল ইচ্ছা তারই চরিতার্থতা ঘটায়। চতুর্বর্গ পুরুষার্থের প্রথম তিনটি প্রবৃত্তি মার্গের অধীন,একমাত্র মোক্ষ নিবৃত্তি মার্গের অধীন।

চার্বাক মতে নৈতিকতা

সাবনুর খাতুন, 2nd Semester

চার্বাকদের নৈতিক মতবাদ তাদের অধিবিদ্যক মতবাদের যৌক্তিক পরিণতি বলা যায়। চার্বাকদের অধিবিদ্যায় জড়বাদ সমর্থিত হয়েছে। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ চার্বাকদের এই জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের যৌক্তিক পরিণতি জড়বাদ(Materialsm)আর জড়বাদের যৌক্তিক পরিণতি সুখবাদ (Hedonism)।

চার্বাক জড়বাদ অনুযায়ী জড় বস্তু একমাত্র সত্তা এবং প্রাণ, মন ও চৈতন্য জড় থেকে উদ্ভুত। ভারতীয় জড়বাদের প্রবক্তা বৃহস্পতি জগতের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলেছেন, প্রাণভরে অসৎ বা অচেতন থেকেই সৎ বা চেতনের উদ্ভব হয়েছিল। চার্বাকেরা জড়বাদ স্বীকার করেন বলেই সুখকে মানুষের পরম পুরুষার্থ বলে স্বীকার করেছেন। তাদের মতবাদ সুখবাদ যেহেতু সুখ অর্থাৎ জীবনের চরম লক্ষ্য বা নৈতিক আদর্শ। চার্বাকমতে দেহই আত্মা। দেহাতিরিক্ত আত্মা বলে কিছু নাই। তাদের দর্শনে দেহাতিরিক্ত আত্মা ঈশ্বর পরলোক অদৃষ্ট পূর্ণ জন্ম প্রকৃতি অশিক্ষিত হয়েছে। তাই ধর্ম অর্থ কাম ও মুখ্য এই চারটি পুরুষার্থের মধ্যে চার্বাকেরা কাম(Desire) অর্থাৎ সুখকে পরম পুরুষার্থ বলেছেন।চার্বাক মতে কামই পরমপুরুষার্থ। তারা কাম বা সুখকে পরম পুরুর্থ এবং সুখলাভের সহায়ক অর্থকে গৌণ পুরুষার্থ বলেছেন। অঙ্গনার আলিঙ্গন হতে উৎপন্ন যে সুখ, তাই জীবনের পরম লক্ষ্য । সুখই মানুষের কাম্য হওয়া উচিত। চার্বাকদের এই মতবাদ নৈতিক সুখবাদ নামে পরিচিত। তাই চার্বাকেরা সুখবাদী।এটিই চার্বাকদের নীতিবিদ্যা বিষয়ক সিদ্ধান্তের ইতিবাচক দিক। চার্বাকদের সুখবাদী নৈতিকতা তাদের অধিবিদ্যক মতবাদ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত। চার্বাক মতে , নিত্য,সনাতন আত্ম বলে কিছু নেই।ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এইচতুর্ভুত স্বভাব বশত কিংবা যদৃচ্ছভাবে মিলিত হয়। এই চতুর্ভুতের সংমিশ্রণে যখন দেহ উৎপন্ন হয় তখন চৈতন্যরও উৎপত্তি হয়। এই চৈতন্য দেহরই ধর্ম, আত্মার ধর্ম নয়। চৈতন্য কেবল জীবদেহেই প্রত্যক্ষ করা যায়। সুতরাং চার্বাক মতে চৈতন্যের আধাররূপে আত্মার সত্তা স্বীকার করা অযৌক্তিক। চৈতন্য দেহে থাকে। তা দেহেরই ধর্ম। এই মতবাদ দেহাত্মবাদ। চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই আত্মা। দেহ ও আত্মা অভিন্ন।দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বে কোন প্রমাণ নাই। দেহঅতিরিক্ত আত্মা না থাকায় চার্বাকেরা পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন না। দেহের বিনাশে আত্মাও বিনষ্ট হয়। চার্বাক মতে ঈশ্বর অস্তিত্বহীন। ইহলোক একমাত্র অস্তিত্বশীল। পরলোক বলে কিছু নাই। মৃত্যুতেই জীবনের পরিসমাপ্তি। তাই তারা বলেন, যতদিন বাঁচবেসুখেই বাঁচার চেষ্টা করবে। কারণ মৃত্যুকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। চার্বাকেরা বলেন, ধর্ম ও মোক্ষ পুরুষার্থ বা জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না। মৃত্যুই অপবর্গ বা মুক্তি। মৃত্যু কোন অমঙ্গল নয়, মৃতের পক্ষেও নয় ,জীবিতের পক্ষেও নয় মৃত্যের কোন অনুভূতি থাকে না । জীবিতের কাছে মৃত্যু উপস্থিত হয় না। তাই চার্বাকেরা বলেন মৃত্যুভয়ে ভীত না হয়ে বুদ্ধিমান মানুষের উচিত জীবনকে নিঃশ্বাস উপভোগ করা। চার্বাক মতে, মোক্ষ বা মুক্তি পুরুষার্থ হতে পারে না। মুক্তি বলতে যদি আত্মার মুক্তি বোঝায়,তাহলে তা অসম্ভব, যেহেতু দেহাত্তিরিক্ত আত্মা নাই।আবার মুক্তি বলতে যদি দুঃখের আত্যান্তিক নিবৃত্তিকে বোঝায়তাহলে তা অসম্ভব। তাই তারা বলেন, কাম বা সুখই পুরুষার্থ।

চার্বাক বা লোকায়ত সম্প্রদায়ের অনুসারীগণ প্রাচীন গ্রীক সফিস্টদের মতই বহু নিন্দিত। পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় দর্শন যে চার্বাক সম্প্রদায়ের কাছে ঋণী তা অস্বীকার করা যায় না। তাঁরা প্রচলিত মতবাদের বিরোধিতা করে জড়বাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাদের সংশয়বাদ স্বাধীন মনের পরিচায়ক, যা কোন মতবাদকে বিচার বিবেচনা না করে গ্রহণ করে না। চার্বাক মতবাদের অস্তিত্ব একথাই প্রমাণ করে যে ,প্রাচীন ভারতের দর্শনচিন্তা ছিল বহুমুখী এবং চিন্তা ও মত প্রকাশের ক্ষেত্রে তখন প্রকৃত স্বাধীনতা ছিল।

বৌদ্ধ দর্শনে নৈতিকতা

রহিমা খাতুন, 2nd Semester

দর্শনের অন্যতম একটি আলোচ্য বিষয় হচ্ছে নৈতিকতা।আস্তিকতাবাদীদের মতে,ঈশ্বরের অভিত্বের বিশ্বা বাতীত কারো পক্ষে নীতিবান হওয়া সম্ভব না।মহামতি বৃদ্ধ কিন্তু এ মতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি তার নীতিকথা দিয়ে এটা প্রমাণ করারও প্রচেষ্টা চালান ঈশ্বরে বিশ্বাস বা ঈশ্বরের কোন ধারণা যে নীতিবান হওয়া যায় এ কথা প্রমাণ করার জন্য তিনিই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে, নৈতিকতা ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ (Autonomous)। তাঁর মতে, কোনো ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন ছাড়াই নৈতিক হওয়া যায়। তাই নীতিবান হওয়ার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের কোনো প্রয়োজন নেই। আর দেব-দেবীর পূজা অর্চনা - এসব অর্থহীন সময়ের অপচয়। একজন বৌদ্ধকে নীতিবান হতে হবে আপন প্রয়োজনে। আধ্যাত্মিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে প্রয়োজন, তা কোন অতিজাগতিক সত্তার ভয় থেকে নয় বা কোন ঐশ্বরিক সত্তা বা শক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য না বরং তা আপন সিদ্ধান্ত প্রসূত। বৌদ্ধ দর্শনে নৈতিকতার দুটি দিক তুলে ধরা হয়েছে।যার একটি নঞর্থক (Negative) বা নেতিবাচক, আর অপরটি সদর্থক বা ইতিবাচক (Positive)। কয়েকটি পয়েন্ট যথা-

১) বৌদ্ধধর্মে নীতিশাস্ত্র বা নৈতিকতাকে শৈল বা শীলা বলে। শিলা কথার অর্থ হলো চরিত্র। এটি একটি আচরণবিধি । প্রাথমিকভাবে অহিংসা বা ক্ষতি থেকে মুক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত।

২) চরিত্র হল নিজের এবং একজনের সম্পর্কের মধ্যে একটি নৈতিক কম্পাস। এটি একটি ইচ্ছাকৃত নৈতিক আচরণ, মুক্তির পথে একজনের অঙ্গীকার অনুসারে।

৩) নৈতিক নির্দেশাবলী বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রের বেশিরভাগ পণ্ডিত এইভাবে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের পরীক্ষা এবং বৌদ্ধ নৈতিকতার প্রকৃতি সম্পর্কে দাবির ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য ঐতিহ্যগত বৌদ্ধ সমাজের নৃতাত্ত্বিক প্রমাণের উপর নির্ভর করে।

জৈনদর্শনে নৈতিকতার স্থান

প্রিয়াঙ্কা পাল, 2nd Semester

ভারতীয় দর্শনে জৈন সম্প্রদায় নাস্তিক দর্শন হিসেবে পরিচিত। জৈনগণ বেদকে প্রামানিক হিসেবে স্বীকার করেন না, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করেন। ঋষভদেব থেকে মহাবীর এই ২৪ জন তীর্থঙ্কর যে দর্শন গড়ে তোলেন তা জৈন দর্শন নামে পরিচিত।

বুদ্ধদেবের মতো মহাবীর ও মনে করেন যে মানুষ তার ইচ্ছা অনুযায়ী কতগুলি নিয়মের প্রতি আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে জন্মরোধ ঘটাতে পারে এবং তা প্রত্যেক মানুষের উচিত কর্ম। কিন্তু সংসার জীবন নির্বাহ করার ক্ষেত্রেও প্রত্যেক মানুষের কতগুলি নিয়ম অনুশীলন করার প্রয়োজন , যার ফলে তাদের আত্মার মুক্তির পথ প্রশস্থ হবে। সন্ন্যাসী বা মঠবাসীদের জন্য যে পাঁচটি নিয়ম পালনের কথা বলা হয়েছে তা জৈন দর্শনের পঞ্চমহাব্রত নামে পরিচিত।

পঞ্চম মহাব্রত হল- "অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ"

অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয় , ব্রহ্মচর্য , অপরিগ্রহ।

উল্লেখযোগ্য , জৈন নীতিশাস্ত্রে জীবের পরমার্থ মোক্ষলাভের জন্য মঠবাসি সন্ন্যাসী বা শ্রমণদের জন্য পঞ্চমহাব্রত উল্লেখ করা হয়।

পঞ্চমহাব্রত অনুশীলনের মাধ্যমেই মুমুক্ষ শ্রমণ তার অন্তর্নিহিত অনন্ত সম্ভাবনাকে রূপায়িত করে অনন্ত জ্ঞান , অনন্ত দর্শন , অনন্ত শক্তি ও অনন্ত আনন্দ এই অনন্ত চতুষ্টয়ের অধিকারী হয়ে এই জীবনে মুক্তির স্বাদ উপলব্ধি করে।

পঞ্চমহাব্রত - এর পাঁচটি ব্রত শ্রমণরা কঠোরভাবে পালন করাই তাদের মহাব্রত বলা হয়।

এছাড়াও শ্রাবকদের অর্থাৎ সাধারণ বা সংসারী মানুষদের জন্য জৈন নীতিশাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে " পঞ্চঅনুব্রত " । জৈন নীতিশাস্ত্রে মুক্তি লাভের জন্য সংসারী মানুষদের অর্থাৎ শ্রাবকদের ত্যাগের দীক্ষা নিতে হবে।শ্রাবকদের অর্থাৎ সাংসারিক মানুষদের জন্য যে পাঁচটি অনুব্রত ধার্য করা হয়েছে তা সহজলভ্য এবং সহনশীল ।

▫অনুব্রতের নীতি গুলির মধ্যে থেকে কয়েকটি নিম্নে আলোচনা করা হলো ◌ঃ

* ক্ষতিকর নয় এমন কোন সচল জীব কে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করব না।

* জাল জালিয়াতিকে প্রশ্রয় দেব না।

* ব্যবসায় ধর্মবিরুদ্ধ ও নীতিবিরুদ্ধ আচরণ করব না।

* চিকিৎসক রূপে রোগীর রোগ উপশমকে অর্থ লোভে বিলম্বিত করবো না।

উপরিউক্ত জৈন দর্শনের নীতিশাস্ত্র থেকে এটা স্পষ্ট যে সকল মানুষের ওপরেই কঠোর নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে তা নয়। সাংসারিক মানুষদের জন্য সহজসাধ্য বা সহনশীল নীতি ধার্য করা হয়েছে। এই নীতির মাধ্যমে কর্মবাদ ও কর্মফল সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাতন্ত্রতা জাগিয়ে তুলে, অর্থাৎ জৈনদর্শনে নৈতিকতা সম্পর্কীয় মতবাদ স্বাতন্ত্রতা দাবি রাখে।

দর্শনে তত্ত্ব ও প্রয়োগ

মাধবী ঘোষ, 6th Semester

ইংরেজি ফিলোসফি শব্দের প্রতিশব্দ দর্শন। দর্শন শব্দটি মূলত সংস্কৃতি শব্দ যার পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে প্রকৃত সত্তা বা অন্তর দর্শন বা তত্ত্ব দর্শন।

দর্শনের বিভিন্ন তথ্য প্রয়োগ রয়েছে।দর্শনের তত্ত্ব প্রয়োগ হলো তত্ত্বের ভিত্তিতে একটি দাবি বা যুক্তি তৈরি করা জড়িত যা অভিজ্ঞতামূলক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত।

দর্শনের পরিধি বা বিষয়বস্তু-

দর্শনের বিষয়বস্তুকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১. অধিবিদ্যা -

2. জ্ঞানতত্ত্ব

3. মূলবিদ্যা

4. মনদর্শন

5. বিশ্ব তত্ত্ব

দর্শনের তত্ত্ব জানতে হলে অবশ্যই দর্শনের আলোচ্য বিষয় দর্শনের লক্ষ্য ,উদ্দেশ্য ,দার্শনিক সমস্যা বলি ,এর আলোচনার পদ্ধতি, ইত্যাদি বিষয় বিষয়াদির আলোচনার পদ্ধতি ইত্যাদি বহু অংশে নির্ভর করে। কাজেই দর্শনের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করতে গেলে সে বিষয়ের উপর আমাদের গুরুত্ব দেওয়া দরকার সেই। তথ্যগুলি নিম্নরূপ হল

১. লক্ষ্য উদ্দেশ্যের আলোক দর্শন

2. আলোচ্য বিষয়ের দিক থেকে দর্শন,

3. সমস্যা বলির দিবালোকে দর্শন,

4. পদ্ধতিগত দিক থেকে দর্শন,

5. জিব দর্শনের আলোকে দর্শন।

দর্শনের স্বরূপ: দর্শনের স্বরূপ সমন্ধে আমরা পৃথক ভাবে আলোচনা করবো। তবে আমরা এই বিষয়ে দর্শনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য,দার্শনিক সমস্যাবলী ও এর বিশ্লেষণ থেকে ও বুঝতে পারি।উদাহরণ: দর্শনের উৎপত্তি নিয়ে অনেক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এর আগে ভাববাদী দের মধ্যে মতভেদ

পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ মনে করেন যে কৌতূহল ও সংশয় থেকে দর্শনের উৎপত্তি। আবার কেউ মনে করেন ব্যাবহারিক প্রয়োগ থেকে এর উৎপত্তি। আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও পিপাসাকেও দর্শনের উৎপত্তির কারণ বলে মনে করেন। দর্শনের লক্ষ্যই হলো সত্য অনুসন্ধান করা।

ব্যবহারিক বেদান্ত ও বিবেকানন্দ

মৌনা লাহা (প্রাক্তনী)

ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈপ্লবিক ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক এবং দার্শনিক স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম ১৮৬৩ খ্রি: ১২ জানুয়ারি উত্তর কলকাতার সিমলা পল্লিতে। তাঁর পিতৃদত্ত নাম নরেন্দ দত্ত বুদ্ধিক শিক্ষার সাথে সাথে শরীরচর্চাও তার কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। তাঁর পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যা, বিজ্ঞা এবং দর্শন। ফলে ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতি, দর্শন এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন শুরুর দিকে তার মধ্যে সংশয়বাদী ভাবনার উপস্থিতি ছিল। কিন্তু ১৮৮১ খ্রি: শ্রী রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং পরবর্তীকালে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ নরেন্দ্রনাথের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। তিনি অতঃপর জগতের কাছে পরিচিত হন স্বামী বিবেকানন্দ নামে। ১৮৯৩ তে তিনি শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে যোগ দিয়ে সনাতন হিন্দু ধর্ম এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সমর্থনে বলিষ্ঠ বক্তব্য রেখে সারা বিশ্বের যুক্তিবাদী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। এই সম্মেলনের পরবর্তী সময়ে তিনি বিশ্বের নানা দেশে আমন্ত্রিত হয়ে অদৈত বেদান্তের দার্শনিক তত্ত্ব শ্রী রামকৃষ্ণের সমন্বয়ী ভাবধারা প্রচার করেছেন। পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সংগতি রেখে স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনের তিনটি মুখ্য বিষয় এখানে আলোচিত হয়েছে -- i) ব্যবহারিক বেদান্ত, ii) বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ, iii) যোগচতুষ্ঠয় ।

নিম্নে স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্ত নিয়ে আলোচনা করা হল ----

১৮৯৪ সালে ১৪ নভেম্বর লন্ডনে প্রদত্ত ভাষনে স্বামীজি বেদান্ত দর্শনের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করেন। স্বামীজি তাঁর ভাষনে সবিস্তারে একথায় বলেন যে, বেদান্ত দর্শন নিছক তত্ত্বগত 'বুদ্ধির কসরত ' নয় তার ব্যবহারিক দিকও আছে ।বাস্তবিক পক্ষে, স্বামীজি তাঁর ভাষনে এটাই প্রতিপাদন করেন য, " বিশুদ্ধ তত্ত্ব " বলে কিছু থাকতে পারে না, তত্ত্ব ওপ্রয়োগের মধ্যে সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। প্রাত্যহিক জীবনের আচার-ব্যবহারের অর্থাৎ কর্মের মূলমন্ত্র প্রচার ও নির্দেশ করাই হল বেদান্তের লক্ষ্য, কর্মহীনতা বা নিষ্ক্রিয়তা লক্ষ্য নয়। নিষ্ক্রিয়তা যদি বেদান্ত দর্শন হয় তাহলে বলতে হবে যে আমাদের চারিদিকের দেয়াল গুলি সর্বাপেক্ষা জ্ঞানবান , কেননা তারা নিষ্ক্রিয় , মাটির ঢেলা , কেটে ফেলা গাছের গোড়া জগতের সর্বাপেক্ষা বড়ো সত্যদ্রষ্টা কেননা তারা নিষ্ক্রিয়।বাস্তবিক পক্ষে, বেদান্তদর্শন আমাদের বাস্তব জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। কর্মদর্শনই বেদান্ত প্রচার করে। বেদান্ত দর্শন আত্ম-উপলব্ধির জন্য আমাদের কর্মে উৎসাহিত করে; মৃত্যু ভয় উপেক্ষা করে জীবনের কল্যান সাধন এবং জড় জগতের সংরক্ষণ প্রনোদিত করে , আর্ত নিপীরিত সমাজ পরিত্যক্ত পাপীকে ভ্রাতৃজ্ঞান আলিঙ্গন করতে বলে এবং সর্বোপরি নিজ মধ্যে সর্বভূতে পরমসৎ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করে বিশ্বপ্রেম জাগ্রত করে। এক কথায় "একম্ এব-অদ্বিতীয়ম্"-এমন উপলব্ধি ঘটিয়ে বেদান্ত দর্শন মানব জীবনের আমূল রূপান্তর ঘটায় তত্ত্বদর্শন এবং কর্মদর্শন , যা একটি অন্যটির পরিপূরক; বিভিন্ন উপনিষদ থেকে আমরা জানতে পারি যে বেদান্তের তত্ত্বদর্শন শুধু পর্বত গুহাবাসী বা অরণ্যবাসী ঋষিদের ধ্যানের ফল নয় তার শ্রেষ্ট তাত্ত্বিক উক্তি গুলি দৈনন্দিন জীবনে কর্মবীর '

জনকের মতো ' রাজাদেরমস্তিষ্ক প্রসূৎ যাদের অপেক্ষা বেশি কর্মব্যস্ত মানুষের কথা আমরা ভাবতে পারি না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্বামীজি বেদান্ত দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্য গীতার নিবিড় কর্মযোগের উল্লেখ করেছেন,যে যোগশিক্ষা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন কে দিয়েছেন ভয়ংকর রনক্ষেত্রে পশ্চাদপদ পটে। একত্বই বেদান্তের কেন্দ্রীভূত আদর্শ এক বই দুই নেই -পরম সৎ ব্রহ্ম বা আত্মা হল এক ও অদ্বয়। স্বর্গবলে কিছু না থাকলে নরক বলেও কিছু থাকতে পারে না, কেননা সর্বব্যাপক ঈশ্বরকে বিশেষ কোনো স্থানে, স্বর্গে অথবা নরকে স্থাপন করা যায় না। সব কিছুই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। সৎ নয়, অসৎ নয়, স্বর্গ নয়,নরক নয়,জীবন নয়, মৃত্যু নয়; -একমাত্র এক অনন্ত ব্রহ্ম বা আত্মায় সর্বে বিরোজিত। বেদান্ত দর্শন বা বেদান্ত সম্মত মানবধর্ম কেবল তত্ত্বের বা ধর্মকে কার্যকারী করার ও নির্দেশ সেখানে আছে। ধর্ম যদি মানুষের কোনো উপকার করতে না পারে, তাহলে মানব জীবনে সেই ধর্মের কোনো প্রয়োজন নেই। আত্মবিশ্বাসের অভাবই-সমুদয় অশুভ শক্তি দুঃখ দুর্দশার মুল কারন , সাধারন মতে যে, ব্যাক্তি ঈশ্বর-এ বিশ্বাস করে না সে নাস্তিক । কিন্তু বেদান্ত দর্শন অনুসারে স্বামীজি বলেন " যার নিজের ওপর বিশ্বাস নে (অর্থাৎ যে বিশ্বাস করেনা যে স্বরূপত সে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর), একজন নাস্তিক। নিজেকে বিশ্বাস করার অর্থ হলো, সকলকে বিশ্বাস করা, কেননা সকলকে বিশ্বাস করলে তবেই নিজের প্রতি বিশ্বাস জন্মায়। বেদান্ত দর্শন মানুষের মধ্যে এমন আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করে তাকে কর্মে উৎসাহিত করে। বেদান্ত দর্শন আরও বলে যে নিজ মধ্যে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে ব্রহ্ম শক্তিতে বলীয়ান হয়ে কর্মসাধন করতে হবে। স্বামীজিতার ভাষনে লন্ডনবাসীকে তথা জগতের প্রতিটি মানুষকে সম্মোধন করে বলেন "হে মহা শক্তিমান জাগুন, উঠে দাড়ান, আলস্য বা নিদ্রা আপনার শোভা পায় না,"-এ কথা ক্ষণকালের জন্য ও ভাববেন না যে আপনারা দুর্দশাগ্রস্ত,পাপী স হে মহা শক্তিমান, জাগুন, উঠুন,আপনার নিজস্বরূপকে কর্মের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করুন দেখবেন কেমন করে বিদ্যুৎ চমকের মতো সব কিছু চকিতে উদ্ভাসিত প্রকাশিতও রূপান্তরিত হচ্ছে। ব্রহ্মোউপব্ধির ক্ষেত্রে অনুভুতির কাজেই মুখ্য-অনুভুতিই ঈশ্বর দর্শন করাতে বুদ্ধি নয়। প্রেম-ভালোবাসাই মানুষের সাথে মানুষের জীবজগতের বন্ধন রচনা করে,একত্ব বা ঐক্য সৃষ্টি করে বুদ্ধি বিভেদকামী, প্রেম মিলনাকাঙ্খীপ্রেম ,ঈশ্বর ঈশ্বরই প্রেম , বেদান্ত দর্শন মানুষকে এমন শিক্ষায় দ। যে দর্শন মানুষকে এমন অমৃতবাণী শোনায় তাকে নিছক তত্ত্বগত বলা চলেন । তার ব্যবহারিক দিকও উল্লেখ হয়।

বেদান্ত মতে,মানুষের দেহে মানুষের আত্মই হচ্ছে একমাত্র ঈশ্বর যা আমাদের একমাত্র উপাসনাযোগ্য । খ্রিস্টানরা বলে 'গড'ই (God) একমাত্র ঈশ্বর , মুসলমানরা বলে আল্লা ছাড়া আর কোনো ঈশ্বর নেই , বেদান্ বলে এমন কিছু নেয় যা ঈশ্বর নয় জগতের সবই এক ও অ ঈশ্বর , ঈশ্বর ছাড়া কিছুই সত্য নয় । জীবই ঈশ্বর এবং জীবদেহ ঈশ্বরের মন্দির আর মানুষের দেহ সর্বত্তম মন্দি - স্বামীজির কথায় সৌধদে মধ্যে তাজমহল এমন মন্দিরে দেবতার উপাসনা করার পরিবর্তে গির্জায় বা মসজিদে বা মানুষের তৈরি দেবালয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করা বাতুলতা মাত্র । মানুষের দেহমন্দিরে ঈশ্বরের সেবা অর্থাৎ মানুষের সেবাই শ্রেষ্ট ধর্ম । এমন সেবাই মানুষের সমাজকে উন্নত করে, মানুষের জীবন কে আনন্দিত করে।এমন বাস্তব সম্মত ধর্ম নজিরবিহীন।

পরিবেশ ভাবনা : একটি পর্যালোচনা

ড: অনুরাধা চট্টোপাধ্যায়

সহযোগী অধ্যাপিকা

দর্শন বিভাগ, কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ

মানুষসহ পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীর জীবনধারণের ক্ষেত্রে পরিবেশের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রতিটি জীব তার জীবন রক্ষার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা সবই পরিবেশের কাছ থেকে আদায় করে নেয়। মূলত পরিবেশকে কেন্দ্র করে মানুষ এবং অন্যান্য জীবকুলের বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু কেবলমাত্র মানুষই তার বিচার বুদ্ধি দিয়ে জীবন রক্ষা ছাড়াও প্রকৃতিকে বোঝানোর চেষ্টা করে এবং এটিকে মূল্যবান বলে মনে করে। যুগ যুগ ধরে মানুষ পরিবেশে যথেচ্ছ ও অপরিক্ষিত ব্যবহার করে আসছে। এবং এর ফলে যখন তার অন্যান্য প্রাণীর জীবন বিপন্ন ও সংকটের সম্মুখীন তখন, প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতিকার কর্তব্য বোধ জাগ্রত হয়েছে। মানব এবং অন্যান্য প্রজাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশের প্রতি মূল্যবোধ - মানুষ মনোননিবেশ করতে সচেষ্ট হয়েছে। মানুষের প্রকৃতি সংক্রান্ত ধারণা বিকাশের দুটি ধারা প্রধানত লক্ষ্য করা যায়। একদিকে প্রাচ্যের প্রতি কেন্দ্রীক দৃষ্টিভঙ্গি। মানুষের প্রকৃতির প্রতি মনোভাব তার ধর্মীয় চেতনার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। প্রাচ্যের প্রকৃতি কেন্দ্রীক ভাবনার উৎস অনুসন্ধান করতে হলে বৈদিক সাহিত্য এবং পুরান প্রভৃতির শিক্ষা গ্রহণ ও বিশ্লেষণ করা জরুরি ,অন্যদিকে পাশ্চাত্যের মানব বীজ " ওল্ড টেস্টামেন্ট "এ বর্ণিত সৃষ্টি তত্ত্বের মধ্যে নিহিত ছিল। ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক তথা জীবনচর্চায় পরিবেশের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সচেতনতা অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কের অন্তর্গতায় তাকে রক্ষার নৈতিক দায়িত্ব ও ভারতীয় চিন্তাধারায় আন্তরিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। সেই কারণেই মাতা ধারিত্রীর বুকে হলকর্ষণের জন্য মানুষ ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আধুনিককালের সমগ্র বিশ্বের মানুষ পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষার্থে বৃক্ষরদ্ধের গুরুত্ব আরোপ করে পালিত হচ্ছে অরণ্য সপ্তাহ। বৈদিক যুগেই সচেতনতার মাত্রা এতটাই জোরালো ছিল যে তখন প্রাকৃতিকে অত্যন্ত সংযমের সাথে ব্যবহার করা হত এবং বৃক্ষের ওপর কখনো মানুষ এবং কখনো দেবতার রূপ আরোপ করা হত।

পাশ্চাত্যের মানবকেন্দ্রিক ভাবনাকে বর্তমান বিপদের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে । জেনেসিস বা "ওল্ড টেস্টামেন্ট"- এ বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বকেই পাশ্চাত্য ভাবধারায় বিকাশের একমাত্র নির্ণায়ক উপাদান চিহ্নিত করা হয়। পাশ্চাত্য দর্শন প্রাচীনকাল থেকেই গ্রিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। থেলসের সময় থেকেই দার্শনিকগণ বৈচিত্র্যময় বস্তু জগতের বাস্তবতায় আগ্রহ না দেখিয়ে বৈচিত্রের মধ্যে অন্তর্নিহিত মূল সত্তার অনুসন্ধান চালিয়েছে থেলস, এনাক্সিমেন্ডার, এনাক্সিমেনস, পারমেনাইডিস প্রমূখ দার্শনিকরা জগতের মূল উপাদান হিসেবে

একটি মৌলিক উপাদানকে স্বীকার করেছেন যদিও সেই মূল উপাদানের স্বরূপ বিষয়ে তারা ভিন্নমত পোষণ করেছেন। "জেনেসিস বা ওল্ড টেস্টামেন্ট " অনুযায়ী ঈশ্বর জগত সৃষ্টি করেন সেই জগতের উপভোগের জন্য অ্যাডাম কে তৈরি করেছিলেন। তিনি মানুষকে অধিকার দিয়েছিলেন প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে। অর্থাৎ মানুষ প্রয়োজন সাধন হল সকল জীবের উদ্দেশ্য।

মধ্যযুগে পাশ্চাত্য চিন্তার ক্ষেত্রেও কোনো মৌলিক চিন্তার বিকাশ ঘটেনি। পরবর্তীকালে আধুনিক পাশ্চাত্য যুগের জনক ডেকার্ট সৃষ্টিতত্ত্বের একটি নতুন ব্যাখ্যা দেন। তার মতে, মানুষের নাগালে থাকা প্রকৃতির উপর মানুষের অধিকার রয়েছে প্রয়োজন এবং সুবিধামতোন রূপান্তর করে ব্যবহার করার। পরবর্তীকালে ফিকটের লেখার মধ্যেও প্রকৃতিকে দাস বানিয়ে রাখার উদ্ধত্য প্রকাশ পেয়েছে। মানবকেন্দ্রিক এই ভাবনার স্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায় যখন জেরিমি বেন্থাম ১৭৮০ সালের সকল প্রাণীর বেদনা অনুভব করার সামর্থের ভিত্তিতে তাদের নৈতিক বিবেচনা পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্তমানে পরিবেশ নীতিবিদ্যা প্রয়োগিক নীতিবিদ্যার একটি শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতির অবক্ষয় অনিবার্যভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ভয়াবহ সমস্যার জন্ম দেবে। আধুনিক বিজ্ঞান লব্ধজ্ঞান এবং প্রকৃতির উপাদান সমূহের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা গঠিত বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণেই মানব অস্তিত্ব নির্ভরশীল - এই উপলব্ধিভিত্তিক প্রকৃতি রক্ষার কর্মপ্রণালীই সংকট মুক্তির পথ। প্রকৃতিকে জয় করা সম্পর্কে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হওয়া ঠিক নয়। প্রকৃতি কিন্তু যেকোনো সময় আমাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারে। ফলে প্রাথমিক সাফল্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। প্রকৃতির উপর সাফল্য ভিনদেশী জনগণের উপর বিজেতার সাফল্য নয়। বুদ্ধিভিত্তিক সম্পন্ন প্রাণী হিসেবে আমরা প্রকৃতির অংশ। তাই প্রকৃতি সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ন্যায় বুঝলেও খুব সচেতনভাবে সহবস্থানের ব্যাপারটি রক্ষা করে চলতে হবে।

জয়শ্রী মন্ডল

সহকারী অধ্যাপিকা

ভূগোল বিভাগ

কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ

প্রিয় ছাত্রীরা,

তোমাদের জন্য একটা খোলা চিঠি লিখতে বসেছি । বলতে পারো নিজের কিছু অনুভূতি এবং ভাবনাগুলোকে তোমাদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্যই এই খোলা চিঠি। যে মুহূর্তে আমি এই ভাবনাগুলোকে অক্ষর দিয়ে সাজাচ্ছি সেই মুহূর্তে অনুভূত হচ্ছে প্রচণ্ড এক হাঁসফাঁস করা গরম সেই সঙ্গে চরম অস্বস্তিকর অনুভূতি । এই অনুভূতি আমার একার নয় নিশ্চয়ই, সারা পৃথিবীব্যাপী প্রত্যেকটি জলবায়ু অঞ্চলের মানুষ ভীষণভাবে অনুভব করতে আরম্ভ করেছে জলবায়ু পরিবর্তনকে।

শুরু করব বেশ কিছু পরিসংখ্যান দিয়ে । পৃথিবীর মাত্র 0.5% স্বাদু জল ।বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় 2 mililion জনসংখ্যা স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় জল সংগ্রহ করতে পারেনা (SDG Report 2022)। বর্তমানে প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা জল সংকটের সম্মুখীন। যা আগামী দিনগুলোতে আরো বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে (IPCC) । এমনও অনুমান শুধুমাত্র জলের জন্যই সংঘটিত হতে পারে আরো একটা বিশ্বযুদ্ধের।

পৃথিবীর বড় বড় নদীগুলি স্বাদু এবং লবণাক্ত জলের যোগান কে অনেকটাই ভারসাম্য রাখে। আমাজন নদী এমনই একটি নদী।

উদ্বেগজনক খবরটি ছিল এইরকম ,আমাজন নদীর অববাহিকা, যা গ্রহের স্বাদু জলের এক চতুর্থাংশ বহন করে এবং বৃহত্তম বৃষ্টি অরণ্যের আবাসস্থল, এটি একটি ঐতিহাসিক খরার কবলে রয়েছে।খরা বেশ কিছুদিন ধরে দৃশ্যমান। ব্রাজিল, যা আমাজন রেইন ফরেস্টের দুই-তৃতীয়াংশ

হোস্ট করে, জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত শুষ্ক মরসুম অনুভব করে যার সময় এটি হালকা বৃষ্টিপাত পায়। এই বছর, মরসুমটি অস্বাভাবিকভাবে তাড়াতাড়ি শুরু হয়েছিল-এটি অস্বাভাবিকভাবে গরম এবং শুষ্কও ছিল। মে মাস থেকে আমাজোনাস এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টিপাত হচ্ছে। কিছু কিছু এলাকায় জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে 42 বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত হয়েছে। 2023 সালের আগস্টে, ব্রাজিলের 26টি রাজ্যের মধ্যে 19টিতে একটি বিরল তাপপ্রবাহ আছড়ে পড়ে। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই অঞ্চলে পরপর 50 দিন তীব্র গরম অনুভূত হয়েছে। 25 সেপ্টেম্বর, দেশের দক্ষিণ-পূর্বঅঞ্চলে তাপমাত্রা বেড়ে 44 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা স্বাভাবিকের চেয়ে 7 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি, এই তাপপ্রবাহটি 30 বছরের মধ্যে একটি ঘটনা ছিল। অ্যামাজোনাস, যা প্রায় সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টি অরণ্যের দ্বারা আচ্ছাদিত, 29শে অক্টোবরের মধ্যে 62টি পৌরসভার মধ্যে 60টিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে এবং বাকি দুটির জন্য সতর্কবার্তা জারি করে। নদী ও খাল দ্বারা বেষ্টিত এই অঞ্চলে মানুষ যাতায়াত ও পরিবহনের জন্য নৌকার উপর নির্ভর করে। জলপথ দ্রুত শুকিয়ে যাওয়ায় যা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নিগ্রোদের আনাভিলহানাস দ্বীপপুঞ্জের অনেক পরিবার, বসবাস করছে আটকে পড়া নৌকাগুলিতে। মাদেইরা নদী 55 বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন জলের স্তর রেকর্ড করা হয়েছে। যার প্রভাব পড়ছে পোর্তো ভেলহোত শহরে।

ইউনিসেফের মতে, "ব্রাজিলের ভূখণ্ডের 18 শতাংশ এবং ফ্রান্সের তিনগুণ বড় এই ভূপৃষ্ঠটি প্রায় 1.5 মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে। তাই এই অঞ্চলের খরার একটা সুদূর প্রসারী প্রভাব থাকবে সারা বিশ্বব্যাপী"। শুধু মানুষের ওপরেই নয় আমাজন অববাহিকার এই খরা প্রভাবিত করেছে পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ বায়োলজিক্যাল হটস্পট এর বন্যপ্রাণীদের। বর্তমানে এখানকার বাতাস বন্যপ্রাণীদেরও শ্বাস-প্রশ্বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে ।

তাপপ্রবাহের ফলে দেশের ইতিহাসে বন্যপ্রাণীর সবচেয়ে ভয়াবহ গণমৃত্যু ঘটেছে। 2023 সালের সেপ্টেম্বর থেকে, আমাজনের একটি উপনদী লেক টেফেতে 150 টিরও বেশি নদীর ডলফিন মারা গেছে। মৃতের সংখ্যার মধ্যে রয়েছে 130টি গোলাপী ডলফিন(একটি প্রজাতি যা 255 সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয় এবং ওজন 200 কেজি) ধূসর নদীর ডলফিন (যার দৈর্ঘ্য 150 সেন্টিমিটার এবং ওজন 50 কেজি) শুধুমাত্র 28শে সেপ্টেম্বর,2023 যখন জলের তাপমাত্রা 39 ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করে, তখন থেকে গবেষকরা টেফেতে ব্রাজিলের হ্রদে 70টি নদীর ডলফিনের মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছে। অক্টোবর থেকে কোয়ারিতে আরও 23টি গোলাপী ডলফিনের মৃতদেহ পাওয়া গেছে।

রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর জোসে এ মারেঙ্গো বলেন, "গোলাপী ডলফিনের ওপর আমরা এমন প্রভাব আগে দেখিনি।"খরা সীমা অতিক্রম করে চলেছে যার কোনও শেষ দেখা যাচ্ছে না। এই অঞ্চলে অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টির মরশুম বিলম্বিত হয়েছে। আই. এন. পি. ই-এর মতে, বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের থেকে অনেক কম হবে, অন্তত আগামী বছরের শুরু পর্যন্ত। সিইএমএডিএএন পূর্বাভাস দিয়েছে যে খরা ডিসেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। মারেঙ্গো বলেছেন যে আগামী বছরও যদি খরা চলতে থাকে তবে তিনি পরিস্থিতি কল্পনা করতে পারবেন না। "এটি একটি সংকট-একটি মানবিক, পরিবেশগত এবং স্বাস্থ্য সংকট। যা আমাদের সবচেয়ে বেশি ভয় দেখায় তা হল সামনে যা রয়েছে "।

আসলে প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে সুদূরে অবস্থিত অ্যামাজন অববাহিকার খরা আমাদেরকে কেন বিচলিত করছে? আসলে এই পৃথিবীর প্রত্যেকটি অজীবজ এবং জীবজগত একে অপরের সঙ্গে জড়িত তাই পৃথিবীর সুদূরে অবস্থিত কোন প্রান্তের ঘটনাও আমাদেরকে প্রভাবিত করবে এটাই স্বাভাবিক ।এই ঘটনা প্রবাহ আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে দীর্ঘদিন আগে থেকেই আমাদের আরো সচেতন হওয়া প্রয়োজন ছিল ।অনেক বেশি নিপীড়ন করেছি আমরা আমাদের এই পরিবেশকে । কি করতে পারি তাহলে আমরা ?দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো দিন যাপন যেমন জলের অপচয় রোধ ,জলের পুনর্ব্যবহার, বৃক্ষরোপণ, বৃক্ষ পালন এবং সার্বিক পরিবেশের প্রতি আমাদের সমমর্মিতা হয়তো কিছুটা হলেও এই পরিবেশকে সুস্থ করে তোলার পথে সাহায্য করবে । পরিশেষে বলি চলো একসাথে সচেতন হই সবাই। পরিবেশকে ভালো রাখি এবং ভালো থাকি।

ইতি,

ম্যাডাম

Atlantic Ocean
VENEZUELA
COLOMBIA
ECUADOR
Amazon
PERU
BOLIVIA
BRAZIL
Pacific Ocean
CHILE
ARGENTINA

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা ভাবনা

সায়নী বিশ্বাস, 2nd Semester

শিক্ষা বা Education কথা উঠলেই একজন ব্যক্তির নাম অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ বলে এই শিক্ষাসমাজ মনে করেন।তিনি হলেন আমাদের সবার প্রিয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি শুধু একজন শিক্ষাবিদ ছিলেন না তিনি ছিলেন নতুন প্রজন্মের একজন পথপ্রদর্শক । রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে,শিখার মূল লক্ষ্য হলো - আত্ম - উপলব্ধি । তিনি নিজের অলিককল্পনা ও অন্ত দৃষ্টির মাধ্যমে নিজের এবং বিশ্বজনীন আত্ম উপলব্ধি ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই উপলব্ধিই হলো শিক্ষার মূল লক্ষ্য। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ এই শিক্ষা ভাবনা নিয়ে তাদের মত প্রচার করেছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই শিক্ষা বিষয় ভাবনা ছিল আর পাঁচটা শিক্ষাবিদ থেকে একদমই ভিন্ন তিনি বলেছিলেন বিদেশিরা যে শিক্ষা ভাবনা কথা বলেন সেই খানে বাইরের শিক্ষা কথা মাথায় রাখা,কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন মানবিক শিক্ষার কথা।তিনি মনে করতেন একজন ব্যক্তির যথাযত শিক্ষা হলো তার মানবিক ধর্ম, একজন ব্যক্তি যতোই পুথিবিদ্যা লাভ করুক না কেনো একজন ব্যক্তি যদি তার আচরণ , ধর্ম , এবং মানবিক দিক থেকে শিক্ষিত না হয় তা হলে তার শিক্ষার কোনো গুরত্বই থাকে না । শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বিখ্যাত উক্তি আছে " সর্বোচ্চ শিক্ষা হলো সেই শিক্ষা যা আমাদেরকে কেবল তথ্য দেয় না বরং যা আমাদের জীবনকে সমস্ত অস্তিত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে " । অর্থাৎ ,তুমি একজন প্রকৃতিভাবে শিক্ষিত তখনই হবে যখন তুমি নিজের আত্ম উপলব্ধি ঘটিয়ে সামঞ্জস্য এবং মানবিক ভাবে সমাজের জন্য কিছু করবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই নতুনত্ব শিক্ষা ভাবনার কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা উল্লেখ করতে পারি সেই গুলি হল -

১. শিক্ষা হলো বাইরের প্রকৃতি এবং অন্ত: প্রকৃতির মধ্যে সমন্বয় ঘটানো। এই বিষয় ব্যাপারে যদি আমরা লিপ্ত হতে পারি তবে প্রকৃত অর্থে শিক্ষা তাকেই বলা হবে।

২. এই শিক্ষা বিষয় একজন মানুষের প্রকৃত কাজ হবে নিজের দেহ এবং মনের মধ্যে সান্নিধ্য ঘটানো যদি সেই এই কাজটি করতে সক্ষম হয় তবে সে আত্ম উপলব্ধি ঘটাতে পারবে।

৩. আমরা এর আগেই দেখেছি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানব এবং প্রকৃতির কথা বলেছেন তিনি বলেছেন যতক্ষণ না একজন ব্যক্তি তার মানবিক ধর্ম কে উপলব্ধি

করতে পারবেন না ততক্ষণ সে নিজের শিক্ষা যথাযত ভাবে কাজে লাগাতে পারবে।

৪. তাই তিনি অহিংসা এবং লোভের পথ ছেড়ে ধর্মের পথ অবলম্বন করতে বলেন তিনি বলেন একজন সৎ ব্যক্তির পক্ষেই এই শিক্ষা লাভ করা সম্ভব।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সমস্ত কথা মাথায় রেখে আমাদের শিক্ষা সমাজ এর জন্য শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন তিনি মনে করেন একজন ব্যক্তির প্রকৃত শিক্ষা প্রকৃতির মধ্যেই সম্ভব ।

এই শিক্ষা ধারণা মূলত উৎপত্তি ঘটে পরিবেশ থেকে অর্থাৎ পরিবেশ হচ্ছ সমস্ত কিছুর অস্তিতের আশ্রয় স্থল। কিন্তু বর্তমান সমাজ সেই বিষয় ব্যাপারে একদমই সচেতন নয় তারা নিজের সিদ্ধি লাভ জন্য পরিবেশ কে ব্যাবহার করে চলেছে । রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর এই বিষয় টা নিয়ে ও বলেন যে তোমাকে তোমার শিক্ষা দানে সাহায্য করছে সে তুমি তাঁর কোনোরকম ভাবে ক্ষতি করতে পারো না। এই প্রকৃতির কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে প্রতি নিয়ত আমাদেরকে শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্য করে চলেছে। পরিবেশ এই বৈচিত্র্য হলো এই শিক্ষা বিষয়। পরিবেশ কথা উঠলেই দর্শন কথা মাথায় রাখা হয়। কারন এই জীবনে দর্শন ছাড়া কোনো কিছুই সম্ভব না। এই দর্শনের বিভিন্ন শাখা রয়েছে যেমন - নীতিশাস্ত্র, রাজনৈতিক বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ইত্যাদি। এই সমস্ত দর্শন এর বিভিন্ন ভাবে তাদের দার্শনিক দিক দ্বারা আমাদেরকে শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন করে। অর্থাৎ, এই দর্শন মূল কথা হলো আদর্শ। নিজের প্রতি সৎ থেকে নিজের শিক্ষা সম্পর্কে জানা। এক কথায় বলতে গেলে দর্শন ছাড়া কোনো কিছুই সম্ভব না। এই পৃথিবীতে সমস্ত কিছুর আঁধার হলো দর্শন। এমন কি এই পরিবেশ ও এই দর্ষিণের এক অপূর্ব সুন্দর একটা অংশ বলতে পরি। তাই শিক্ষা সম্পর্কে দর্শনের এই মতবাদ প্রতি নিয়ত আমাদেরকে শিক্ষা লাভ সাহায্য করে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথের গান ও মানবচেতনা

তৃষা কর, 6th Semester

মানবচেতনার স্বরূপঃ-

তাঁর সমগ্র ভাবনায় মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পরিব্যাপ্ত। রবীন্দ্রনাথ কেবল প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বস্তুরাজিকেই মনুষ্যত্বপূর্ণ করে তোলেনি, ঈশ্বরকেউ মনুষ্যত্বপূর্ণ করেছেন। মানুষের ধর্ম গ্রন্থে গ্রন্থটির উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমাদের ঈশ্বরের মানবতা বা মানুষের গ্রন্থের মূল উপজীব্য।"

মানবচেতনার মূল বক্তব্য:- রবীন্দ্রনাথের ভাববাদ মানবতাবাদী, তিনি বলেন, "এটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে জগতকে আমরা যেমন দেখি জগৎ ঠিক তেমনি। আমরা আমাদের মনকে দর্পনরূপে কল্পনা করি। কল্পনা করি যে বাহ্য জগতের ঘটনাবলি প্রায় নিখুঁতভাবে এই দর্পনে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। আমাদের মনকে যথাযথভাবে নিবদ্ধ করতে পারলে বন জঙ্গলে বাধমান রূপে প্রতিভাত হতে পারে, আনন্দদায়ক বিষয়গুলো দুঃখদায়ক মনে হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় জীবন, ছন্দ,সৌন্দর্য, সামঞ্জস্য, ক্রোধ, ভালোবাসা, আনন্দ,সঙ্গীত ইত্যাদির ধারনা অতি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর কাব্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে তা বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে মানবতার কবি ছিলেন তা তাঁর সৃষ্টিকর্মের মধ্যে বিশদভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তার বিভিন্ন গানের মধ্যে আমরা মানবতার জয়গান দেখতে পাই।

যেমন- "যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন

সেইখানে যে চরন তোমার রাজে

সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে" ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন দার্শনিক এর সাথে তিনি একজন কবিও বটে। তিনি সৌন্দর্যের রূপরেখায় সত্যকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। এবং তার দ্বারা মানুষের সঙ্গে বস্তুর একটি ব্যক্তিগত বন্ধন প্রতিষ্ঠাকরেন। তিনি শুধু মানুষ নয় বিমূর্ত আকাশ, বাতাস, জল, মাটি, দেশকে ভালোবেসে অনেক গান রচনা করেছেন।

যেমন- "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি"।।

রবীন্দ্রনাথের মতে আদর্শ মানবতা:-

রবীন্দ্রনাথ মানুষের অন্তর্নিহিত মানবতাকে বা আদর্শ মানবকে ঈশ্বরূপে গণ্য করে মানবসেবাকেই ঈশ্বরসেবা বলেছেন। জগতের মহান ধর্মগুলিও মানুষের মধ্যেই পরমসত্তা ঈশ্বরের সন্ধান করেছে, মানুষের বাইরে কোনো অতিবর্তী দেবতার নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ সেই

বিরাট পুরুষকে, মানুষের অন্তরতম সত্তাকে অর্থ্যাৎ মহামানবরূপে ঈশ্বরকে উদভ্রান্ত হয়ে খুঁজে বেরিয়েছে, বাইরের জাগতে, পাহাড়ে,পর্বতে বনাঞ্চলে, কখনো মানুষ নির্মিত দেবালয়ে। যাকে সে পায়নি আরনা পাওয়ার হেতু হল, দেবতা মানুষের বাইরে নেই, দেবতারূপী সেই আদর্শ মানবতা বা মহামানব আছে মানুষের মন-মন্দিরে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষের দেবতা মানুষের 'মনের মানুষ'। ঈশ্বরপ্রেমে পাগল পথের ভিখারি ফকির হয়ে গেয়েছেন-

'আমি কোথায় পাব তারে

আমার মনের মানুষ যেরে।

হারায় সেই মানুষে তার উদ্দেশ্যে দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে'।

সেই নিরক্ষর পাগল বাউলই গানের মাধ্যমে উত্তর দিয়ে বলেছেন ,

'মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ'

রবীন্দ্রনাথের গানেও একথা অনুরণিত হয়েছে বারংবার -

'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাইনি বাহির পানে চোখ মেলেছি আমার হৃদয় পানে চাইনি'।

রবীন্দ্রনাথের গানগুলি গভীর অর্থবহ এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ।

পরিশেষে বলা যায়যে, সম্ভবত এটাই রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গীর কারন। তিনি বলেন, মানবতায় আমার প্রগাঢ় আস্থা আছে। এটি সূর্যের মত মেঘাচ্ছন্ন হতে পারেকিন্তু কখনও নির্বাপিত হয় না।

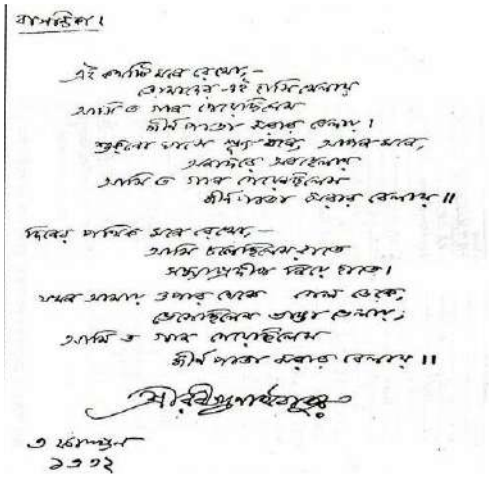

রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ধারায় মানবতাবাদ

পর্ণা দেবনাথ, 6th Semester

চিন্তা নায়ক রবীন্দ্রনাথ যিনি একাধারে কবি, দার্শনিক,প্রেমিক যেনো অসংখ্য সৃষ্টিশীল ঢেউ সমাবেশের এক অতলান্ত জলরাশি।তাঁর নিভৃত চেতনায় প্রাথমিকভাবে ওতপ্রতো ছিল উপনিষদ্,বৌদ্ধ দর্শন, বৈষ্ণব ভাবের ধারা, ইন্দ্রিয়গত,সৌন্দর্যবোধের ধারা ও যুক্তিবাদের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের মতো বেদান্তে নিহিত মানবতাবাদের আদর্শকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রচার করেছেন।এই আদর্শ হল জনকল্যাণ।'The Religion Of Man' গ্রন্থে তিনি বলেছেন ঈশ্বরের মানবিকতা বা মানুষের ঐশ্বরিকতা হল তাঁর গ্রন্থের মুখ্য বিষয়। তিনি কখনও মানুষকে ঈশ্বরের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন আবার কখনও ঈশ্বরকে মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

মানবতাবাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Humanism'। 'Humanism' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Humanitas' থেকে এসেছে।'Humanitas'শব্দের অর্থ হল: জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। রবীন্দ্রনাথের যে কোন লেখা বা কবিতার মধ্যে আমরা মানবিকতার সম্পর্ক পেয়ে থাকি।যেমন- কোনো নদীর বর্ণনায় খেয়া পারাপারের ঘটনা বা কোনো ফুলের বর্ণনায় তা মানব আত্মার সংবাদ বাহকরূপে উপস্থাপিত হয় তাঁর কলমের মধ্য দিয়ে।আত্মত্যাগ-ই মানবতার মূল কথা।কবির ভাষায়-

"আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি আমার বাঁশির সুরে সাঁড়া তার জাগিবে তখনই।"

রবীন্দ্রনাথের মতে, মানুষের স্বভাব বা ধর্মের একটি দিক হল 'দুর্লভ সত্তা'।একে মানবসত্তা বা মানবিক সত্তা ও বলা হয়।মানব সত্তা বা বিশ্ব মানবিক সত্তা মানুষের অন্তর আত্মা।একে রবীন্দ্রনাথ 'উদ্‌বৃত্ত' বলে উল্লেখ করেছেন। মানুষ স্বরূপত বিশ্বমানব,মানবব্রহ্ম, মানুষ -ই ভগবান।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই মানবতাবাদের বীজ নিহিত আছে।এই জন্যই তিনি মানবতাকে মানুষের ধর্ম বলেছেন।'ধর্ম' শব্দের অর্থ স্বভাব। সুতরাং মানবতাবোধ মানুষের স্বভাবেই নিহিত আছে। সর্বজনের কল্যাণ সাধন-ই মানবতার আদর্শ।

তিনি আরও বলেন, প্রেমের মাধ্যমে ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে বিশ্বমানবের সামঞ্জস্য ঘটে-আমার মধ্যে অপরকে; অপরের মধ্যে আমাকে প্রেমের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ মানব ধর্মের ক্ষেত্রে বারংবার ত্যাগ ও তপস্যা করেছেন।তিনি বলেছেন-"ত্যাগের দ্বারা আমরা দারিদ্র ও রিক্ততা লাভ করি এমন কথা যেন আমাদের মনে না হয়।পূর্ণতর রূপে লাভ করবার জন্য আমাদের ত্যাগ"। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'ত্যাগ' কে শূন্যের মধ্যে বলেননি বরং পরম পূর্ণ্য ব্রহ্মেই সবকিছু সমর্পণ করার কথা বলেছেন। মানুষ ত্যাগের-তপস্যায় সেই অমৃতত্ব লাভ করবে,তাই মানুষের ধর্ম।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা

সৌমি আচার্য, 2nd Semester

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা বলতে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত ছবি সমূহ কে বোঝায়। ঠাকুর তার সাহিত্য এবং গানের জন্য খ্যাতিমান। চিত্রশিল্পী হিসাবে তার পরিচয়টি গৌণ। তার আকার ছবির সংখ্যা দুই হাজারের বেশি, তার চিত্রকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য তার নিজের সখ পদ্ধতি।যেকোনো কবিতাতে কাটাকুটি হলেও তিনি কাটাকুটির মধ্যে একটি সুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তুলতেন । তার ছবি ভারতীয় ঐতিহ্য গত চিত্রকলার কোন কাঠামোতে শ্রেণীবিন্যাস করা যায় না। নিজের আঁকা ছবি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, কিন্তু ওইগুলি কেবল লেখায় নয়, ওইগুলি তার থেকেও বেশি কিছু। রবীন্দ্রনাথের ছবিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে যেমন - ১.নরনারীর মুখের ছবি, ২. জীব বস্তু প্রতিকৃতি প্রকৃতির পটভূ ভূমিকায় মানুষের চিত্র, ৩. অলংকারের চিত্র, ৪. প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি ইত্যাদি। বৈষয়িক জীবনে রবি ঠাকুরের মনে যে ভাবাবেগ, আবেগ, হৃদয়-বেদনা ও সৌন্দর্য বোধের উদয় হতো তা তার চিত্রে প্রতিফলিত হতো।

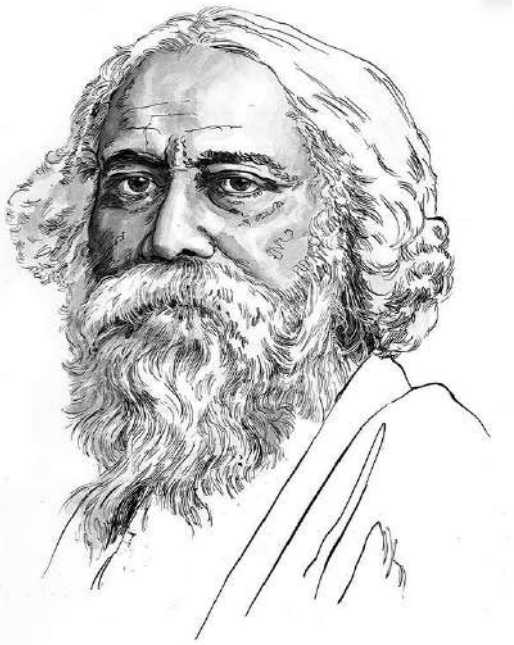

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ব্যাখায় মানবতাবাদ

অনন্যা বিশ্বাস, 6th Semester

মানবেন্দ্রনাথ রায় বিশ্বাস করতেন এবং অনুধাবন করেছিলেন যে সমকালীন ইতিহাসের অভিজ্ঞতা মানুষের দীর্ঘকাল ধরে লালিত সনাতনী এবং বৈপ্লবিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ধারণা ও আদর্শ গুলির মধ্যে নিহিত প্রতারণামূলক যুক্তিগুলি উন্মোচন করে দিয়েছে গণতান্ত্রিক এবং মার্ক্সবাদী রাজনৈতিক তত্ত্বগুলির মধ্যে কোনটিই আধুনিক জীবনের সমস্যা গুলি সমাধান করার সামর্থ্য দেখাতে সক্ষম হয়নি। তিনি মনে করেছেন যে সভ্য বিভ্রান্ত মানব সমাজ বর্তমান নৈতিক বিশৃঙ্খলা ও বৌদ্ধিক বিভ্রান্তি থেকে বেরিয়ে আসার পথই দেখতে পেয়েছে। যার মধ্যে থেকে তাকে বেছে নিতে হবে সামগ্রিকতাবাদী ব্যবস্থার সুরক্ষা এবং কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের নিশ্চয়তায় বিশ্বাস স্থাপন। তিনি বিশ্বাস করতেন সমকালীন সংকট কাটিয়ে উঠতে হলে জনজীবনে "নৈতিক মূল্যের" পরম গুরুত্বকে স্বীকার করে নিতে হবে এবং এর জন্য সমাজ দর্শন ও রাজনৈতিক তত্ত্বগুলিকে সম্পূর্ণ নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। তিনি তার বহুল অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে বাইরে থেকে বহু নীতি ও আদর্শের কথা বললেও প্রতিক্রিয়াশীল বা বৈপ্লবিক সব সমাজ দর্শনের মূল লক্ষ্য হলো ক্ষমতা দখল। এবং জনজীবনে নৈতিকতা আনতে হলে এমন এক রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রয়োজন যা ক্ষমতা দখলকে কোন সামাজিক পরিবর্তনের পূর্ব শর্ত হিসেবে স্বীকার করে না। এই তথ্যকে অনুমান করে নিতে হবে সেই সমাজ দর্শন থেকে যা মানুষকে তার প্রাধান্য ও সার্বভৌমত্বের স্থানে কেন প্রতিষ্ঠিত করে।

বর্তমান সংকটের কারণ হলো বিচারবোধ ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির উপর আবেগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। আর সৃজনশীল হতে হলে মানুষকে তার কার্যকলাপ বিচারবোধ যুক্ত চিন্তা ভাবনার দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। সমাজ পুনর্গঠনের কাজে নিয়োজিত সব প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন মতাদর্শের ব্যর্থতার কারণ ছিল বিচারপথের পরিবর্তে আবেগের উপর মুখ্য গুরুত্ব দেওয়া। এভাবেই মানুষের আচরণে ভারসাম্য হারিয়ে যাবার কারণেই বর্তমান সংকটের সৃষ্টি হয়েছে তিনি মনে করতেন যে বর্তমান যুগের সব রাজনৈতিক তত্ত্বই ব্যক্তি মানুষকে সমষ্টি মানুষের মধ্যে বিলীন করে দিয়েছে । মানবেন্দ্রনাথ মনে করতেন যে বর্তমান সংকট হল মানুষের অস্তিত্বের সংকট যা অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অথবা সংস্কৃতিক সংগঠন সংকটের চেয়েও গভীরতর এই সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব যদি সভ্য জগৎ নব মানবতাবাদের দর্শন দ্বারা উদ্‌ভূত হয় অর্থাৎ নব মানবতাবাদ হল এমন এক ব্যাপক দর্শন যার সামাজিক রাজনৈতিক চর্চাকে যুক্তিবাদিতা ও নৈতিকতা এবং বৈজ্ঞানিক অধিবিদ্যার সঙ্গে যুক্ত করে। মানবেন্দ্রনাথ এর নতুন দর্শন হলো নবমানবতাবাদের দর্শন। কোন গভীর চিন্তা বা ধ্যানের দর্শন নয় এই হল সামাজিক রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের দর্শন অর্থাৎ মানুষকে তার প্রাধান্য ও সার্বভৌমত্বের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে। তাঁর মতে মানবতাবাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো এই বিশ্বাস যে কিছু মানবিক মূল্যবোধ সব বিবেচনাকে ছাপিয়ে যায় এবং মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানোই হলো জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য কিন্তু পুরনো

মানবতাবাদের মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু ভ্রান্ত ধারণা মানবতাবাদী জীবন দর্শনকে অস্বীকার করত এই কারণেই মানবতাবাদ এই ভ্রান্ত ধারণা গুলির বিরুদ্ধে। এই কারণে তিনি তাঁর প্রদত্ত মানবতাবাদ এর মূল বৈশিষ্ট্যে গুলির মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে নিজেকে সব সবিরোধিতা ও প্রতারণামূলক যুক্তির হাত থেকে মুক্ত করতে হবে আর যেহেতু এর মধ্যে নতুনত্ব এসেছে আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞানের মধ্যে থেকে সেহেতু আরও সঠিকভাবে তার এই মানবতাবাদকে বৈজ্ঞানিক মানবতা বাদ ও বলা যায়।

বিজ্ঞান বনাম মানবতাবাদ নয় বরং বিজ্ঞান এবং মানবতাবাদী হল নব মানবতাবাদের দৃষ্টিকোণ তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে মানব কল্যাণে তার সফল প্রয়োগ করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে তিনি বারট্রান্ড রাসেলের দর্শনের কথা বলেছেন যেখানে দর্শনের প্রধান সমস্যা জড় বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের মধ্যে সেতুবন্ধন করার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। মানব প্রচেষ্টা এবং জ্ঞানের সমন্বয় সাধনের ধারায় মূল্যবোধ তৈরি করা হয়। সব মূল্যবোধ বিচারের উৎস বহু দিক থেকে নিজেকে প্রকাশ করার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং তাকে ফলপ্রসু করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আবেগ ও বিচারবোধ তার আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করাই হচ্ছে সর্বজনীন পন্থা এবং এই কারণেই বিচারবোধ নৈতিকতার পক্ষে আবশ্যিক হয়ে পড়ে। মানুষের অগ্রগতির পেছনে মূল কারণটি দেখা যায় মুক্তি ও সত্যের অনুসন্ধান এর মধ্যে। যা হলো মানব প্রকৃতির মূল প্রেরণা। মানবতাবাদের আকাঙ্ক্ষা হলো মুক্ত নারী পুরুষের এক বিশ্বজনীন সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করা। এক সমাজ যেখানে ব্যক্তিগত জীবন ও আচরণ এবং সামাজিক সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যক্তিগত সৃজনশীলতা এবং জ্ঞানদীপ্ত সহযোগিতার মনোভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত করতে হবে।

শয়তান সন্দর্ভ

সুমন ভট্টাচার্য

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

তোমার অসীমে আদিম আমার দ্রোহ/ তোমার আশিস ধ্বংসলীলায় ব্রতী তোমার করুণা আমার এ করতলে ভ্রষ্ট, পিষ্ট। আদিম সেই নাশব্রতী।

ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাকে বারংবার যিনি চুরমার করেছেন তিনি শয়তান।

ভারতীয় পুরাণাবা পুরাণকল্প যথাযথ ভাবে শয়তানকে বিবৃত করেনি তেমন কিন্তু বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে মার। রবীন্দ্রনাথের গানে, "আমি মারের সাগর পাড়ি দিব গো" সেই মার। ভারতবর্ষে বসবাসের আগে যদি ইউরোপ থেকে ঘুরে আসা যায়, একবার! সেখানে শয়তান- Satan এক শবল চরিত্র। হ্যাঁ-শবল অর্থাৎ বহুবর্ণ বিশিষ্ট |

কিন্তু আদি satan এঁকে কিন্তু দেখা যায় ঈষৎ ভিন্ন এক চরিত্রে- Boak of Job- এ, স্যাটান ঈশ্বর-ভীত চরিত্র। বাইবেল-এ, জোব ছিলেন Uz - উজ নগরের বাসিন্দা, তাঁকে বিভিন্নভাবে পীড়া দিয়ে ঈশ্বর পরখ করে দেখেছিলেন তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তা আর বিশ্বস্ততা |

এই পর্যায়েই স্যটানকে প্রায় লেলিয়েই যেন দেওয়া হয়, সেই যন্ত্রণার সঙ্গী সহচর। অবশ্য জোব, যন্ত্রনা-নির্যাতন সহ্য করেও অবিচল থাকায় ঈশ্বর প্রত্যার্পণ করেন জোব-এর প্রাপ্য সুখী-জীবন। কিন্তু জোব, যেমনই থাকুক, স্যাটান, কিন্তু বাইবেলের প্রাচীন তম অংশে ছিলেন না। কিন্তু জোব-কে কষ্ট দেওয়ার জন্য তাঁকে ঈশ্বরই পাঠিয়েছিলেন, আর তাঁর যাবতীয় দুষ্কর্মই ছিল ঈশ্বর-আদিষ্ট এবং ঈশ্বরকতৃক সীমাবদ্ধ। স্যাটান-এর একটি পরিচয় তিনি বিদ্বেষকারী বা বিদ্বেষ-। তিনি কেবল নালিশ করেন,অভিযোগকারী। আর এখান থেকেই ইহুদি অ্যাপোক্যালিপটিসিজম অর্থাৎ বৈশ্বিক বিনাশবাদের জড়িয়ে গেলে স্যাটান হয়ে যান ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর স্থান বা সংস্থান ঈশ্বরের পরেই। বাইবেলের Gospel - অর্থাৎ "gospel" পর্যায়ে, New Testament, (লুক 4:6) অংশে সমগ্র রাজত্বই- তাঁর হস্তগত বা তাঁর অধিকারস্থ বলে জানানো- এই, শুরু শয়তানের অধিপত্য। অর্থাৎ বাইবেলের ঈশ্বরের আদেশে যার কুকীর্তির সুচনা- যদি এভাবে বিচার করা হয়, ঈশ্বরের আদেশ তো জানেন সেই স্যাটান এবং ঈশ্বর গড়-মানুষের কাছে তো। কোনো সংবাদ নেই সে আদেশের ! ফলত তাঁর সেই উৎপীড়ক অবস্থাকে গ্রহণ করলো, একদিকে ইহুদি বৈনাশিকতার বিশ্বাস এবং পারসিক দ্বৈতবাদ। আর বাইবেলের গসপেল পর্যায়ে তারই পরবর্তী চরিত্রায়ণ ঈশ্বরবিরোধী ঈশ্বরদ্রোহী এক বিশেষ শক্তি।

আমার ক্ষমতা অবিনাশী তাই আমি/ বৈনাশিকের প্রবৃত্তিতে/ মানুষকে আমি টেনে আনি চৌম্বকে/ এই ক্ষমতায় ঈশ্বরও বিস্মিত।

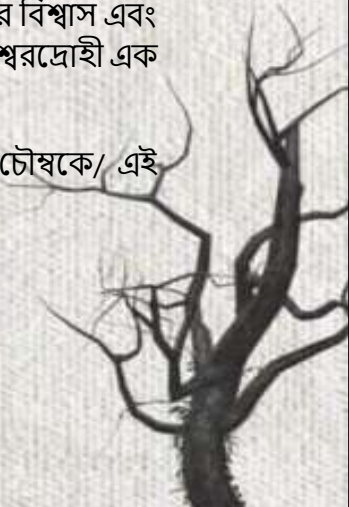

স্যাটান, একটি অত্যুজ্জ্বল চরিত্র। দেশে দেশে-ধর্মে ধর্মে তাঁর বিভিন্ন নাম। একটি পরিচিত নাম Devil - এর আদিতে আছে গ্রিক- diabolos – তাঁর পরিচয় বাইবেলের স্যটানের জটে অভিন্নই। তবে শয়তান সগৌরবে দেখা দিলেন জন মিলটনের *Paradise Lost, Paradise Regainned*এ যেখানে তিনি Lucifer – ছিলেন একজন archangel মুখ্য দেবদূত। লুসিফার স্বর্গের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আয়োজনে এই পর্বে তাঁর নির্বাসন ঘটে নরকে। পরিচয় হয় স্যাট্যান অভিধায়।

প্রতিশোধের স্পৃহায় স্যাটান বিভিন্ন কৌশলের উদ্ভাবন করতে থাকেন, তারই অন্যতম কৌশল সেই দ্বিতীয় সত্তাসাপের বেশ ধরে বা অকৃতি নিয়ে আদম ইভকে নিষিদ্ধ ফল খেতে প্ররোচিত করেছিলেন শয়তান। বস্তুত মিলটনের Paradise lost যে অনুভূতি আর সত্যবোধের শীর্ষচারিতায় পৌঁছেছিল, একজন যথার্থ কবির পরিপ্রশ্ন সজ্জায়, তার উৎসে ছিলেন এই দেবদ্রোহী লুসিফার। লুসিফারের আঁধারেই মিলটন, যথাথ মানবতার অনেকগুলি মৌল প্রশ্নকে উত্থাপিত করেছিলেন তার জ্যোতি বা দ্যুতিতেই *Paradise Lost*এক চিরায়ত কবিতা | যে প্রশ্নগুলি তখনকার মানুষজন তো বটেই পরবর্তী পর্বেও, ধর্মধ্বজীদের ভয়ে এবং prejudice অর্থ যে সংস্কার, বদ্ধমূল সংস্কারের কারণে আত্মবিশ্বাসের অভাবে করতে পারেন না , সেই প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছে লুসিফারের - শয়তানের - সুনিশ্চিত প্রত্যয়ী আচরণ আর ক্রিয়ায়। বলা যায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অন্যতম প্রতীক এই লুসিফার।

শয়তানের আরেকটি রূপ মেফিস্টোফিলিস Mephistopheles - মধ্যযুগের বিশ্বাস- ধারণা- সংস্কার থেকে গড়ে উঠেছিল demonology-কী বলা হবে একে ? দৈত্যবিদ্যা নাকি দৈত্যতত্ত্ব? কল্পিত হয়েছিল সাতজন মুখ্য দৈত্য-demon বা শয়তান devil-এর উপাখ্যান। তাদেরই অন্যতম ছিলেন এই মেফিস্টফিলিস। তার প্রথম ব্যাখ্যা ক্রিষ্টোফার মার্লোর বিখ্যাত Doctor Faustus (১৬০৪) এ | আর তারপর গ্যায়টের Faust(১৮০৮)- এগ্যায়েটের Faust (দ্বিতীয় খণ্ড-১৮৩২) এ মেফিস্টফিলিস অন্যতম সমান্তরাল নায়ক। আর এখন থেকে যেন আপেক্ষা করেছিল শয়তানের বিবর্তনপর্ব। মেফিস্টফিলিস- অত্যন্ত স্থিতধী - রসিক এবং প্রতিপদে সংশয়ী | এভাবে বলাই যায় ভারতীয় চার্বাক দর্শন আর ন্যায়দর্শনের তীক্ষ্ণ তর্ককূট তার য়ুরোপীয় প্রতিনিধি এই মেফিস্টোফিলিস।

জীবনশৈলী গঠনে বেদান্ত যাপন

ইন্দ্রাণী মণ্ডল

সহকারী অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ

মানবজীবনের দুটি দিক - একদিকে রয়েছে তাঁর বাহ্যদর্শন আর অন্যদিকে আন্তর দর্শন, যেন একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। বাহ্যদর্শনে ধরা দেয় বৈচিত্র্যময় ভিন্ন ভিন্ন জীব,বস্তুসমূহে ভরপুর এই জগৎ। আর আন্তরদর্শনে প্রতিভাসিত হয় সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক গুণ অনুযায়ীকাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মর্ষ – এই ষড় রিপুর ক্রিয়াকলাপ। এই ষড় রিপুর কল্লোলে মানব জীবন যেন বহমান নদীর মত চলছে। বহমান নদীর যেমন জোয়ার - ভাঁটা, এপার ওপার ভাঙ্গার তাণ্ডব চললেও সে কলকলিয়ে মদমত্ত হয়ে অনন্ত সমুদ্র অভিমুখীর অভিযাত্রী এবং অনন্ত সমুদ্রে মিলিত হওয়াই তার মহত্ত্ব ও গৌরব তেমনি জীবনের যাবতীয় বাহ্য অন্তর কল্লোল মদমত্ত তাকে অতিক্রম করে অন্তর্মুখী দৃষ্টিতে গভীর থেকে গভীরতর গহন গভীরের সেই সর্বব্যাপী অনন্ত জ্ঞানেই তাঁর মহত্ত্ব ও গৌরব লুকায়িত। তাই তো দ্রষ্টা ঋষির মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ বাণী – "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম " অর্থাৎ সত্য জ্ঞান অনন্তই ব্রহ্ম , "অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম" অর্থাৎ এই আত্মাই ব্রহ্ম , "অহং ব্রহ্মাসি" অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্ম, "ত্ত তত্ত্বমসি" অর্থাৎ তুমি সেই ব্রহ্ম। এবাণী মোক্ষ অর্থাৎ মুক্তির ধ্বজা উড়িয়ে মানবজীবনশৈলীর পূর্ণতা কোথায় তা জাহির করে মাত্র। মানবজীবনশৈলীর পূর্ণতার অনন্ত জ্ঞানসমুদ্রকে শ্রবণ করায় মাত্র। কিন্তু সেই অনন্ত জ্ঞান সমুদ্রে অবলীলায় ভাসতে গেলে বেদান্তযাপন অর্থাৎ আত্মস্বরূপের মনন নিদিধ্যাসনই সহায়। কেউ যদি সর্বব্যাপী অনন্ত জ্ঞান সমুদ্রে ভাসতে চায়, পর্যবেক্ষণ করতে চায়, ষড় রিপুর মোহময়তায় গর্জিত কর্ষিত ক্রিয়ায়িত জড় জগতে বিচরণ করেও অবলীলায় মুক্ত স্বাধীন মননে ভেসে বেড়াতে চায় তাহলে বেদান্ত যাপনই তাঁর কাণ্ডারী।

মানবজীবনশৈলী পূর্ণরূপে বিকশিত হয় ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থ চরিতার্থের মধ্যে দিয়ে। অর্থ কাম এই দুই পুরুষার্থের প্রয়োজনে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মর্ষ এই ষড় জড়প্রবৃত্তি মানব মননকে কর্ষণ করে, যা অচেতন বিনাশ শীল জড় প্রকৃতিস্থানীয়। অর্থ কাম এই দুই পুরুষার্থমূলক প্রবৃত্তি কখনই জীবকে তুষ্টি দেয় না বরং অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত তার কামনা বাসনা আরও বৃদ্ধি করে- "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।। "অর্থাৎ কাম্য বস্তুর উপভোগে কখনও কামনার শান্তি হয় না, ঘৃতসংযোগে অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধি পায়। পুরুষার্থ স্বরূপ কাম বলতে জীবের যাবতীয় কামনা বাসনাকে বোঝায়। পুরুষার্থস্বরূপ এই কাম সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত হলে সৃষ্টির লীলাখেলাই থমকে যাবে। সুতরাং কামনা বাসনার অতি বৃদ্ধিতে মানবজীবনে জড়প্রকৃতির ধ্বংসলীলার তাণ্ডব চলে, শান্তি বিঘ্নিত হয় আবার কামের বিলুপ্তিতে সৃষ্টিলীলা লয় পায়। এমতাবস্থায় এই দুই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার কি উপায়? আমাদের ঋষিরা মার্গদর্শন করিয়েছেন–"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যাক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিৎ ধনম্"।। অর্থাৎ এই জগতে যা কিছু আছে সবকিছুতেই সর্বব্যাপী অনন্ত জ্ঞান ব্যাপ্ত হয়ে আছে। সেই অনন্তজ্ঞান অনুভব ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা ত্যাগ পূর্বক আসক্তিশূন্য হয়ে ভোগ কর, অপরের ধন (অর্থ) কামনা কর না। বেদব্যাস রচিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাষায় বলেছেন–'বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্। ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ'।। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা৭.১১) অর্থাৎ হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমি বলবানদের কামনা বাসনা আসক্তি রহিত বল, আর প্রাণীদের ধর্ম অবিরুদ্ধ অর্থাৎ ধর্মের অবিরোধী অনুকূল কাম হই। এখানে অনন্ত সত্য আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই আমি। মানবজীবনে অর্থ কাম –এই দুই পুরুষার্থস্বরূপ প্রবৃত্তিতে মন বুদ্ধি অতি থেকে অতিমাত্রায় কল্পিত ক্রিয়ায়িত প্রভাবিত হলে ধ্বংসাত্মক পরিণামের দিকে প্রবাহিত হয়ে, প্রবল ঝোড়ো

হাওয়ায় মাটি থেকে গাছ সমূহ যেমন সমূলে ভূপতিত হয় তেমনি মানবজীবনশৈলী পূর্ণতার দিকে বিকশিত না হয়ে ধরাশায়ী হয়। আবার অনেকসময় ধ্বংসাত্মক লীলাতাণ্ডবেই অনন্ত জিজ্ঞাসা উদয় হয়- আমি কে ? এই জগৎ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে? এই জগৎ কি উপাদান দিয়ে তৈরি? দুঃখ কষ্ট বেদনা ইত্যাদি প্রতিকূল পরিস্থিতির প্রভাব থেকে বাঁচার উপায় কি? এইরূপ অনন্ত জিজ্ঞাসা বা বিচার উদয়পূর্বক মন বুদ্ধির গভীর থেকে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টিমূলক একাগ্রতায় অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণে রত হওয়াই বেদান্তযাপন পথে প্রবেশ অর্থাৎ ধর্মপথে প্রবেশ ঘটে যা রাজপথও বটে। এখানে "ধর্ম" কোন Religion নয়। ধর্ম হল এই ব্রহ্মাণ্ডের শাশ্বত অবিনাশী কালজয়ী নিয়ম যা শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ ও অনুভব করা যায়। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে- 'দৈবরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা ন হিসুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্মঃ 'অর্থাৎ 'হে নচিকেত! ইতঃপূর্বে দেবগণও এ বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছেন। এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও সাধারণ লোকে উত্তমরূপে বুঝিতে পারে না; ধর্ম এই আত্মা স্বভাবতই অণু অর্থাৎ দুর্বিজ্ঞেয়'। বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে–'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্‌পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ 'অর্থাৎ' যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত ও অভ্যন্তরস্থ এবং পৃথিবী যাহাকে জানে না; পৃথিবী যাহার শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে পরিচালিত করিতেছেন; তিনিই তোমার জিজ্ঞাসিত অবিনাশী অন্তর্যামী আত্মা'। শ্রুতি থেকে স্পষ্ট হয় সর্বব্যাপী অন্তর্যামী সূক্ষ্ম আত্মাই সূক্ষ্ম ধর্ম। মনুসংহিতায় ধর্মের প্রমাণ স্বরূপ বিষয়ে বলা হয়েছে- 'বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ। এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্'।। অর্থাৎ বেদ, স্মৃতি, সদাচার, আত্মতুষ্টি- এই চারটি ধর্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ। অর্থ কাম পুরুষার্থ স্বরূপ প্রবৃত্তি মানবজীবনকে তখনই ধ্বংসাত্মক ভাবে দুঃখ বেদনায় মননকে জর্জরিত করে ভূপতিত নিপীড়িত করতে পারে যখন মানব মন বুদ্ধি অনন্ত সর্বব্যাপী চিৎ সত্য স্বরূপ পরমজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞাত অর্থাৎ অজ্ঞ, আর বেদান্তযাপনই মন বুদ্ধিকে অনন্তজ্ঞানমুখী অর্থাৎ বেদান্ততত্ত্বমুখী করে বুদ্ধি থেকেও শ্রেয় অনন্ত সর্বব্যাপী আত্মার স্বরূপ অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ করায়। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বলা হয়েছে – দেহ ইন্দ্রিয়াদি থেকে মন শ্রেয়, মন থেকে বুদ্ধি শ্রেয়, বুদ্ধি থেকে আত্মা শ্রেয় – 'ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ'।। মানবজীবন যদি দেহ ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধিতেই সীমায়িত হয়ে থাকে তাহলে মানবজীবনশৈলী কখনই পূর্ণতা পায় না, স্বতন্ত্রতায় অধিষ্ঠিত হয় না, আত্মশুদ্ধি ও আত্মশক্তিতে বলীয়ান মুক্ত ও স্বাধীন মনন গঠিত হয় না, তাকে সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক গুণান্বিত ষড় রিপুর তাড়ণায় কর্ষিত জড় অচেতন মন বুদ্ধির অধীনস্থ হয়ে বিচরণ করতে হয়। কিন্তু বেদান্তযাপনে সেই সত্য, অনন্ত, অবিনাশী, সৌরজগতের সব থেকে শ্রেয় চিৎ সর্বব্যাপী পরমজ্ঞানস্বরূপ আত্মার পর্যবেক্ষণ ও অনুভব হয়, আর তখনই মানবজীবনশৈলী পূর্ণতায় স্বতন্ত্রতায় চেতনায় স্বপ্রতিভায় উজ্জীবিত উদ্ভাসিত হয়ে যোগস্থ সমত্ববুদ্ধিতে সর্বকল্যাণমুখী হয়। এখানেই মানবজীবনের বিশেষত্ব , মহত্ত্ব ও গৌরব।

কোন এক আকাঙ্ক্ষা, কামনা বাসনা পূর্ণ হলেই জীবন তৃপ্ত হয় না, অন্য কোন এক আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনায় মন বুদ্ধি উদ্বেলিত হয় আবার যদি তার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ না হয় তাহলে হতাশা গ্রাস করে। এইরূপ অবস্থায় বেদান্তযাপনই একমাত্র পথ। বেদান্ত যাপন সেই বস্তুকে অনুভব ও পর্যবেক্ষণ করায় যা লাভ হলে তাঁর থেকে অন্য কোন লাভ অধিক বলে মনে হয় না এবং যাবতীয় দুঃখ ইত্যাদি কঠিন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অন্তঃকরণ ও বিচলিত হয় না- "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুনাপি বিচাল্যতে'।। আর সেই কারণে বেদান্তযাপনে ধ্বংসাত্মক তাণ্ডব পরিস্থিতিতে ও ধীর স্থির অবিচল থেকে কর্তব্য পালন করা সম্ভব হয়ে ওঠে আর সেইসঙ্গে ধর্মস্বরূপ আত্মা অভিমুখী, বেদান্ততত্ত্বস্বরূপ যাত্রাপথে ধর্ম (কোন Religion নয়, মানবজীবনের সর্বব্যাপী অবিনাশী শাশ্বত আত্মস্বরূপ) ও মোক্ষ (মুক্তি) স্বরূপ পুরুষার্থ চরিতার্থ হয়ে মানবজীবনশৈলী সম্পূর্ণভাবে পূর্ণতায় সচেতনতায় মুক্ততায় বিকশিত হয়।

মধ্যযুগীয় দর্শন চর্চা: একটি আলোচনা

কল্পিতা নন্দী

বিভাগীয় প্রধান ও সহকারী অধ্যাপিকা

দর্শন বিভাগ, কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ

সভ্যতা সৃষ্টি তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা সকলেই কমবেশি সকলে আগ্রহী আবার আগ্রহীও নই সৃষ্টির সেই প্রথম লগ্ন থেকে। তবে এই সভ্যতার সৃষ্টি তত্ত্বের প্রতিফলন তাই বারবার বৈদিক পরবর্তী স্তুতি বাস্তব গানে এবং প্রাচীন সাহিত্যতত্ত্বে দেখা যায় দেশ কাল পাত্র ভেদে। যা একটা স্তরে উন্নীত হওয়ার পর দর্শনকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করে দর্শনরূপে গৃহীত হয়েছিল। দর্শনের উৎপত্তি দর্শন শব্দের অর্থের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফিলোসফি শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ Philosophos থেকে। যার অর্থ Lover of Wisdom। আর Philosophia শব্দটির অর্থ হল Love of Wisdom or Knowledge।জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ বা অনুরাগ এই ধারণা থেকেই আমরা বিভিন্ন অজানা তথ্যের সন্ধানে সর্বদা ব্রতী এবং আগ্রহী, সেখানে সৃষ্টিতত্ত্বের মতো গুঢ় বিষয় সম্পর্কে জানার আগ্রহ খুব স্বাভাবিক। শুধু তাই নয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য নির্বিচারবাদকে খন্ডন করা ও সবিচার বাদের প্রতিষ্ঠা করা গৃহীত তত্ত্বের সত্যতা যাচাই করে তবেই সেই তত্ত্বকে স্বীকার করার বিষয়টি যা দর্শনকে স্বতন্ত্রতা প্রদান করেছে। পূর্বে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রাচীন সাহিত্যে সৃষ্টি তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই একই বক্তব্য প্রযোজ্য।

এই সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রাচীন পুরান তত্ত্বের ব্যাখ্যাতেও পাওয়া গিয়েছে। প্রাচীন গ্রিসের আয়নিক (Ionian) ও ভারতীয় উপনিষদীয় চিন্তাবিদদের আলোচনায় এই প্রাচীন বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা একটি পর্যায়ে এসে ভাঙতে শুরু করে। অর্থাৎ নতুন চিন্তাধারার প্রবেশ ঘটতে শুরু করে ৮০০ - ৫০০ BCথেকেই।তার কারণ হিসেবে অনেকগুলি বিষয়কে চিহ্নিত করা যায় যার মধ্যে দুটি বিষয়ের অবতারণা এখানে এই আলোচনায় আবশ্যিক -

১) পৌরাণিক ও প্রাচীন ধর্মানুষ্ঠান কেন্দ্রিক প্রেক্ষাপট এর ব্যাখ্যা ও সৃষ্টি তত্ত্বের ব্যাখ্যার মধ্যে তত্ত্বগত বিস্তর ফারাক সেই সময় পরিলক্ষিত হয়।

ফলস্বরূপ, ২) সৃষ্টিতত্ত্বে মানুষের অস্তিত্ব ও বিশ্বতত্ত্ব এই দুইয়ের ব্যাখ্যার মধ্যে বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টির প্রতিফলনের একটা অবশ্যম্ভাবী চাহিদা অনুভূত হয়েছিলো। যা সেই সময় পৌরাণিক সৃষ্টি তত্ত্বের ব্যাখ্যায় অনুপস্থিত ছিল বলে মনে হয় এই সময়ই সময়ে ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র রূপে দর্শনের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ ঘটে যা পূর্বে একটা সময়ে অভিন্ন রুপে পরিগণিত ও গৃহীত হয়ে আসছিল। যদিও ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে পার্থক্য করা খুবই কঠিন ও দুরুহ বিষয় কিন্তু তত্ত্ব ও প্রয়োগ বারংবার এই দুটি বিষয়ের মধ্যে ভিন্নতার দাবি রাখে।

পঞ্চম থেকে তৃতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত প্রাচীন গ্রিসে এবং ভারত ও চীন দেশে এই অভিব্যক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। প্রাচীন গ্রিসে যেমন প্লেটো, এ্যারিস্টটল, ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর, পারস্যে জরাথ্রুষ্ট, ইসরাইলে ঈশা এদের সকলের বক্তব্য, ভাবনাচিন্তা ওদর্শন চিন্তা এক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়।এই সময়ে দর্শন ও দার্শনিক চিন্তা এবং চর্চার বিকাশ যেভাবে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হচ্ছিল সেই প্রেক্ষাপটে সেই সময়কালকে আশ্চর্যজনক দার্শনিক ক্রিয়া-কলাপ এর যুগ বললে ভুল হবে না যার মধ্যে বৌদ্ধিক চিন্তাধারার প্রতিফলন সামাজিক সংস্কার মূলক কাজের মধ্যে অন্যতম।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে সেই সময়কার গ্রাম্য সহজ সরল জীবন যাপন ও তাদের জীবন দর্শন উন্নত শহুরে সংস্কৃতিকে ও তাদের জীবন দর্শনকে অনেকটা প্রভাবিত ও পথ দেখাতে সমর্থ

হয়েছিল।সামাজিক ক্ষেত্র থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক বল একত্রিত হয়ে সমাজে ধর্মীয় যাজক বা ব্রাহ্মণদের এবং ব্যবসায়ীদের প্রতিপত্তিতে যে বাড়বাড়ন্ত দেখা গিয়েছিল তার ওপর অনেকখানি আঘাত আনতে সক্ষম হয়েছিল এই পরিবর্তিত বৌদ্ধিক চিন্তাধারা। অর্থাৎ সমাজে প্রচলিত গোঁড়ামী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা সবিচার বাদের প্রচলনের প্রতিফলন আমরা এই দার্শনিক চিন্তা ও চর্চার মাধ্যমে দেখতে পাই। যা সমাজ সংস্কারের প্রথম ধাপ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

সামাজিক অস্থিরতা, সংগ্রাম যা সেই সময়ের সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যাকে আরও বেশি বাড়বারন্তের দিকে নিয়ে গিয়েছিল ধর্মীয় কুসংস্কার এর প্রাধান্যতা। এ সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই এর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল এক অস্থির অনিশ্চিত জীবন থেকে মুক্তি লাভ করা।আর এই অস্থিরময় জীবন থেকে মুক্তির আলোর দিকে যাত্রা কে ত্বড়ান্বিত করেছিল মধ্যযুগীয় দর্শন চর্চার বৌদ্ধিক ও অন্তর্দৃষ্টি চিন্তাধারার প্রতিফলন - যা প্রাচীন গোড়ামী সংস্কৃতির ধারাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। বাতাসে সংগ্রামের কলরব ছড়িয়ে পড়েছিল।যার উল্লেখ আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রূপে সেই সময়ের সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে দেখতে পাই।রাজতন্ত্রের ধর্মতন্ত্রের অবসানের সূচনা ঘটেছিল এক আত্মসচেতন বৌদ্ধিক ব্যক্তি মানুষের চিন্তাধারার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে।এই পর্যায়ে বা সন্ধিক্ষণে সমগ্র বিশ্বজুড়ে উদ্ভব হয়েছিল হেটেরোডক্স অর্থাৎ বৈধর্মিক দর্শনের। শুধুমাত্র প্রাচীন গ্রিসে নয় ভারতেও তার উদ্ভব ঘটেছিল চার্বাক বৌদ্ধ আজীবক দর্শনের মাধ্যমে। অন্যদিকে পাশ্চাত্যে গ্রিসের Sophist, Stoic এঁরা অগ্রগন্য।

এই আলোচনাকে শুধুমাত্র ভারতীয় প্রেক্ষাপটের আঙ্গিকে যদি সীমাবদ্ধ করা যায় তাহলে অষ্টম থেকে তৃতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়কে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে:

প্রথম পর্যায়ে প্রাচীন উপনিষদীয় জল্পনার বিকাশের সূচনা পর্যায় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ধর্মীয় গোঁড়ামি শুন্য চিন্তা বা দর্শনের বিকাশ। যেমন বিভিন্ন নাস্তিক দর্শন চার্বাক জৈন বৌদ্ধ দর্শনের অভ্যুত্থান।আমরা সর্বদা জেনে এসেছি দর্শন চর্চা সর্বদা উচ্চতর কর্তৃত্বের পরিবর্তে যুক্তি, সত্য, বাস্তব অভিজ্ঞতা, অন্তর্দৃষ্টির প্রাধান্য কে গুরুত্ব দিয়েছে। যেমন প্রাচীন সাবেকি বৈদিক ধর্মগ্রন্থ গুলির আলোচনা পদ্ধতি থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

ভারতবর্ষে দর্শন শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সংকীর্ণ অর্থে শুধুমাত্র সত্যের দেখা আর বৃহত্তর অর্থে মানুষের মন বাস্তবকে যেভাবে দেখছে বা উপলব্ধি করছে এই অর্থেও ভারতীয় দর্শন এ "দর্শন" শব্দটিকে গ্রহণ করা হয়েছে।সুতরাং ভারতীয় দর্শনের চিন্তাধারা বিকশিত হয়েছে বৌদ্ধিক জ্ঞান ও যৌক্তিক চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে এবং প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান ভিত্তিক ধর্মীয় ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে।

পরিশেষে বলা যায়, পরিবর্তন তা সে জীবন-যাপন, দর্শন চর্চা, বিশ্বাস, মতামত যাই হোক না কেন তা অবশ্যসম্ভাবী হবে। মধ্যযুগীয় দর্শন চর্চা প্রচলিত প্রাচীন দর্শন চর্চা ও ধর্মচর্চার পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ঘটেছিল বৌদ্ধ, জৈন, জড়বাদ, বেদান্ত, ন্যায়, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা সমস্ত দর্শনে। একটি ধর্ম বা সমাজে গড়ে ওঠা দর্শন চর্চা যখন ভৌগোলিক গন্ডী পেরিয়ে তার ক্ষেত্র অন্যত্র প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয় তখন প্রচলিত মূল্যবোধ, জীবনযাত্রার প্রণালী, বিশ্বাস, ধর্ম সমস্ত কিছুই প্রভাব বিস্তার করে পুরনো ও নতুন সমাজের ধর্ম ও দর্শন চর্চাকারীদের মধ্যে। উদাহরণস্বরূপ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের ও দর্শনের কথা বলা যায়। প্রচলিত ধর্মের বিপরীতে বৈধর্ম হিসেবে অবস্থান করে সমাজে নিজ ধর্মমত অবতরণে ও প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিল এই সমস্ত দর্শন চর্চা। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যে এই বৌদ্ধিক যৌক্তিক ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মতের বহিঃপ্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা না হলে দর্শনচর্চার গতি ব্যাহত হত। আর এই অপ্রচলিত বৈধর্মের উদ্ভব ও প্রসার না হলে হয়তো দর্শন চর্চা এত সমৃদ্ধ হতো না এবং মানব জীবনের সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন পথের সন্ধান পাওয়া যেত না।